শ্রীদিলীপকুমার গুপ্ত

করকমলেষু

॥ কুসুমের স্মৃতি ॥

একজন বৃদ্ধ মশগুল হয়ে রয়েছেন। এখনো তাঁর পাকা সোনার মত রঙ। দোহারা গঠন। মুখমণ্ডলে সামন্ততান্ত্রিক দাঢ্যের দীপ্তি। ভ্রম জন্মে ঘুমন্ত সিংহ বলে।

তাঁর সুমুখে মেহগিনির মূল্যবান একখানা টেবিল। তার ওপর ফুল-বাগিচার একটি নক্সা। দেয়ালে অত্যন্ত মহার্ঘ একখানা অয়েল পেন্টিং। প্রাচীন দামী সুদৃশ্য ফ্রেমে আঁটা। দেখলে চোখ ফেরান যায় না।

ফুল-বাগিচার নক্সাখানা দেখে মনে মনে হাসছিলেন সোমেশ্বর। তাঁর কত দিনের স্বপ্ন আজ প্রায় সফল হতে বসেছে। সারা পৃথিবীর ফুল সংগ্রহ করে তিনি রচনা করবেন তাঁর এই উদ্যান। শুধু গোলাপ ফুল—শ্বেত, পীত, লোহিত আরও বহু রকম।

যৌবনের স্বপ্ন তাঁর বার্ধক্যে নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ স্বপ্ন যে তাঁর তা ঠিক বলা চলে না, স্বপ্ন ছিল সোমেশ্বরের যুবতী স্ত্রী কুসুমকুমারীর। এখন স্মৃতি হয়ে রয়েছে বৃদ্ধের।

বড় ব্যাথার স্মৃতি—

তোমার জন্য তো কিছুই করতে পারলাম না।

রোগ-শয্যা থেকে কুসুম জবাব দিল, কেন যথেষ্টই তো করলে! কিন্তু এত চিকিৎসায়ও যে ফল হল না এইটাই আশ্চর্য! তারপর একটু থেমে সে ফের বলল, জানালাটা খুলে দাও তো।

॥ কুসুমের স্মৃতি ॥

একজন বৃদ্ধ মশগুল হয়ে রয়েছেন। এখনো তাঁর পাকা সোনার মত রঙ। দোহারা গঠন। মুখমণ্ডলে সামন্ততান্ত্রিক দাঢ্যের দীপ্তি। ভ্রম জন্মে ঘুমন্ত সিংহ বলে।

তাঁর স্মুখে মেহগিনির মূল্যবান একখানা টেবিল। তার ওপর ফুল-বাগিচার একটি নক্সা। দেয়ালে অত্যন্ত মহার্ঘ একখানা অয়েল পেন্টিং। প্রাচীন দামী সুদৃশ্য ফ্রেমে আঁটা। দেখলে চোখ ফেরান যায় না।

ফুল-বাগিচার নক্সাখানা দেখে মনে মনে হাসছিলেন সোমেশ্বর। তাঁর কত দিনের স্বপ্ন আজ প্রায় সফল হতে বসেছে। সারা পৃথিবীর ফুল সংগ্রহ করে তিনি রচনা করবেন তাঁর এই উদ্যান। শুধু গোলাপ ফুল—শ্বেত, পীত, লোহিত আরও বহু রকম।

যৌবনের স্বপ্ন তাঁর বার্ধক্যে নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ স্বপ্ন যে তাঁর তা ঠিক বলা চলে না, স্বপ্ন ছিল সোমেশ্বরের যুবতী স্ত্রী কুসুমকুমারীর। এখন স্মৃতি হয়ে রয়েছে বৃদ্ধের।

বড় ব্যাথার স্মৃতি—

তোমার জন্য তো কিছুই করতে পারলাম না।

রোগ-শয্যা থেকে কুসুম জবাব দিল, কেন যথেষ্টই তো করলে! কিন্তু এত চিকিৎসায়ও যে ফল হল না এইটাই আশ্চর্য! তারপর একটু থেমে সে ফের বলল, জানালাটা খুলে দাও তো।

সোমেশ্বর জানালাটা খুলে দিলেন। দ্বিতলের গবাক্ষপথে সূর্যের শেষ রশ্মি এসে পড়ল কুসুমের মুখে চোখে। সোমেশ্বর অধীর হয়ে ঝুঁকে পড়লেন স্ত্রীর মুখের ওপর। মুমূর্ষু, তবু কত সুন্দর। যেন শেষ বেহাগের একখানি করুণ রাগিণী।

আমার ইচ্ছা করে কি জান—বলতে লজ্জা করছে তোমার কাছে।

'না না, লজ্জা কি কুসুম, যা তোমার একান্ত মনের বাসনা তা বলে ফেল।'

তুমি আমার জন্য কোনও স্মৃতি-স্তম্ভ বা মন্দির না গড়ে, একটি বাগান তৈরী ক'রো—গোলাপ ফুলের বাগান। বার মাস যেন ফুল ফুটে থাকে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বসন্তে।

গোলাপ কি তা ফোটে?

জানি না, চেষ্টা করে দেখো। বাঁচব না, কিন্তু আমার সাধ রইল অনন্ত।

বিচলিত হয়ে পড়লেন সোমেশ্বর। কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন।

মমতাজের মত আমার বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে, কিন্তু কোথায় সে ঐশ্বর্য?

কিন্তু তোমার সাধ যে দিল্লীর বাদশাহ-পত্নীকেও হার মানিয়েছে। মমতাজ বেঁচে রয়েছে পাষাণে, তুমি বাঁচতে চাও কুসুমে!

মানুষে কি তা পারে না? প্রেম কি মানবে পরাজয়? জীবনের সান্ধ্য-গোধূলিতে কুসুম প্রগলভা হয়ে ওঠে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলে, কি বলো আমি কি ভুল বকছি? শুধু ভুল?

না, না কুসুম। তুমি স্থির হও। প্রেমিক সব পারে। পারে অকালেও ফুল ফোটাতে। তোমার বারমাসের সন্ধ্যা ও সকাল আমি সুরভিতে ভরে রাখব। তুমি চুপ কর, স্থির হও।

কুসুমের চোখ দুটি একেবারে স্থির হয়ে গেল। খেয়ালী মহিলার মুখখানা ভরে উঠল বিদায়ের ম্লান হাসিতে।

দুর্দান্ত সোমেশ্বর রায় চৌধুরী আর বিয়ে করলেন না। মন দিয়ে শাসন এবং সংরক্ষণ করতে আরম্ভ করলেন তার সুবৃহৎ জমিদারী। একেবারে বাস্তবে ডুবে গেলেন সোমেশ্বর।

তিনি তাঁর স্ত্রীর সামান্য শ্রাদ্ধ ছাড়া যে আর কিছু করলেন না, তাতে পরগণার লোক বিস্মিত হয়ে গেল। এত বড় জমিদারের হল কি? ছাপান্ন পরগণার মালিক!

কিন্তু তিনি দরিদ্র নারায়ণের সেবা করতে ভুল করলেন না। বিলি করলেন দশ হাজার গজ কাপড় এবং সেই অনুপাতে তণ্ডুল। দীন-দুঃখীরা বললে, ধন্য, ধন্য মনিব!

সন্ধ্যার প্রাক্কালে হাজার কাজ থাকলেও তা ফেলে যখন তিনি পায়চারী করতেন বাতায়নের কাছ দিয়ে, তাঁকে জলদ-গম্ভীর দেখাত। অত্যন্ত জরুরী কাজ থাকলেও তাঁকে কেউ বিরক্ত করতে আসতে সাহস পেত না।

পুষ্পোদ্যানের পরিকল্পনায় তিনি তখন মশগুল। মগ্ন স্মৃতিতর্পনে।

তিনি মনে মনে স্থান নির্দেশ করলেন, বাতায়নের সুমুখের দিগন্তজোড়া মাঠ। এখন রিক্ত পড়ে থাকে, কিন্তু বর্ষা এলে চাষ চলে, পৌষে কাটা হয় ফসল।

জমি জমিদারের খাসে নয়, রয়েছে প্রজাপত্তনে বিলি হয়ে। অনেকখানি জায়গার প্রয়োজন। এতখানি খাস-করা বা নিলাম ক'রে দখল নেওয়া অসম্ভব। ঘোর বাদী হবে ছোট বড় প্রজা।

নখদর্পণে সমস্ত দেখলেন সোমেশ্বর।

কিন্তু তাঁর মনের কোণে রয়ে গেল তাঁর স্ত্রীর শেষের কবিতা।

এর পর দীর্ঘ চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে। যুবতী সুন্দরী স্ত্রীর বাসনার কবিতা আর তিনি ফোটাতে পারেননি গোলাপের রক্তদলে।

প্রথম বিঘ্ন সৃষ্টি করতে এল এক বাইজী। অল্প বয়সী নারী, অনবদ্য তার দেহশ্রী। ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে তার গলে পড়ে লাবণ্য। দারুণ গ্রীষ্মেও তার গানের গমকে বুঝি বা নামতে পারে শ্রাবণের বাদল।

প্রমোদতরী উদ্ভাসিত হল। সাজল মাঝি মাল্লা দাঁড় বৈঠা নিয়ে। টলমল করে উঠল নদীর জল।

স্পষ্ট অনুভব করলেন সোমেশ্বর তার ভিতরও কি যেন টলমল করছে। কি যেন ভারকেন্দ্র-চ্যুত হবে এক্ষুনি।

তিনি উঠে পায়চারী আরম্ভ করলেন।

একজন বরকন্দাজ এসে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল। পুরো ছ'ফুট উঁচু বেয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতি।

দাঁড়াও।

গুরুগম্ভীর স্বরে সোমেশ্বর বললেন, বাইজীকে উঠিয়ে দিয়ে এস ষ্টেশনে। দেখো, যে কষ্ট করে সে এখানে এসেছে গরুর গাড়িতে চড়ে, সে-কষ্ট যেন পথে সে না পায়। আঙুর বেদানা সঙ্গে দিও, আউর ঠাণ্ডা সরবৎ।

বাইজী দেশে ফিরে না গিয়ে জেলায় গেল। সোমেশ্বরের এক শরিকের যোগসাজসে তাঁর বিরুদ্ধে একটা মানহানির মামলা জুড়ে দিল।

কয়েক মাসের মধ্যেই মামলায় হার হল বাইজীর।

নির্লজ্জা বাইজী সোমেশ্বরের কাছারীতে ফিরে এসে কুর্ণিশ জানাল। একান্তে দেখা করতে চায় সে।

সোমেশ্বর মঞ্জুর করলেন তার প্রার্থনা।

কি চাই তোমার ?

রাহা খরচ। এবার দেশে চলে যাব।

কত টাকা ?

আমার নাচ ও গানের মূল্য যা মনে করেন তাই।

দেখছি তোমার জিভে লজ্জা নেই—তোমাকে কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।

সোমেশ্বর পায়চারী করতে করতে কয়েকবার ওর সর্বাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

বাইজী হেসে ফেলল। হুজুরের মেহেরবানী।

গুটি দুই যেন তূর্যধ্বনি হল, সনাতন! সনাতন!

উত্তর এল, কম্পিত কণ্ঠে, ডাকছেন ?

'এতক্ষণে বুঝলে? যাও, এই দুঃসাহসিকাকে বাইরে নিয়ে যাও, হুকুম যা তা পরে জানাচ্ছি।

হাত তুলে একটি ভঙ্গুর ভঙ্গিমায় সেলাম জানিয়ে বাইরে চলে গেল বাইজী। অনেকটা সময় কেটে গেল। তবু যেন মনে হতে লাগল এই প্রকোষ্ঠেই রয়ে গেছে এক রমণীর হাসি এবং লীলায়িত গতি।

সারাদিন সোমেশ্বর কি জানি কি ভাবলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে হুকুম করলেন, নিয়ে এস নির্লজ্জাকে এখানে ধরে। ফটক বন্ধ কর। দেউড়ীতে পাহারা বসাও।

বাইজীকে পাওয়া গেল না।

কোথায় গেল, গর্দান যাবে তোমাদের। পাঠাও ঘোড়-সওয়ার চারিদিকে।

এখন আর সোমেশ্বর পায়চারী করছেন না। চেয়ে রয়েছেন সেই গবাক্ষ পথে, যতদূর দৃষ্টি চলে। ধূলোর কুণ্ডলী উড়িয়ে ছুটল চারটা তাজা ঘোড়া। অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল ক্রমে।

কুস্থমের কবিতার কথাও এখন আর মনে নেই জমিদারের। ভাবছেন একবার পেলে হয় বাইজীকে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই খবর এল যে বেহায়া বাইজী নাকি নাচছে সোমেশ্বরের ছোট হিস্থার বারোয়ারীতলা রস্থলপুরে। অবশ্য তারা জ্ঞাতি নয়।

শরীর জলে উঠল। ধমনীতে চন্‌চন্ করে বইতে লাগল রক্তস্রোত। সোমেশ্বর যিনি প্রায় পৌনে ষোল আনা বাদশাহী বন্দোবস্তের মালিক, তাঁর হুকুমের অপেক্ষা না করে হঠাৎ বাইজী কিনা করল অন্তর্ধান।

জমিদারের ইমারতের মত উঁচু সম্মান রক্ষা করতে দলে দলে লেঠেল প্রজা ছুটল।

খুন-খারাপি দু-একটা হ'ল। ঝাড়-লণ্ঠন ভাঙল অনেক। কিন্তু বাইজীকে ধরা গেল না।

সোমেশ্বর দেখলেন যেন তাঁর চাইতেও অপমানিত হয়েছে প্রজারা। অর্থের অহঙ্কারে গর্জে উঠলেন সোমেশ্বর। তোমরা ক্ষুণ্ণ হয়ো না, আমি পিছু হটছিনে। এর রেশ চলবে জেলায়, থানায়, কলকাতায়।

নীরবে প্রজারা চলে গেল অভিবাদন জানিয়ে।

তারপর স্থদীর্ঘ দিন ধরে মামলা চলে দফায় দফায়। লোয়ার কোর্টে হার হলে আপীল দায়ের করা হয় আপার কোর্টে। দাঙ্গা হাঙ্গামাও চলতে থাকে মাঝে মাঝে। বাঘে মোষে যুদ্ধ চলে, ক্ষয় হয় শুধু নলখাগড়ার ঝাড়।

কোন পক্ষেরই জেদ পড়ে না, কিন্তু জেরবার হয়ে যেতে থাকে জমিদারী।

একদিন কাগজের মহাসমুদ্রে ডুবে যায় তড়িতাঙ্গী বাইজী।

তখন মামলা ঘোরে ভিন্ন মুখে। ফোজদারী কোর্ট থেকে আদালতে আসেন উভয় পক্ষ। স্বত্বের তত্ব নিয়ে, দলিলের মুসাবিদা নিয়ে ওঠে সূক্ষ্ম তর্ক।

বক সোমেশ্বরের মুখে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ পড়ে।

পৌণে এক আনী এখন পর্যন্ত লড়ছে কিসের জোরে? তিনি তো প্রায় নাজেহাল হয়ে যাওয়ার যোগাড়।

ওরা জমিদারীর টাকাটা কারবারে খাটাচ্ছে। মুনাফাটা ঘুরিয়ে ফেলছে মামলায়।

ফন্দিটা মন্দ নয়।...

সোমেশ্বর এবার তামাক ধরলেন। ইতোমধ্যেই একটু একটু মদ ধরেছিলেন। তাতে কোন কাজ হচ্ছিল না। খাঁটি বাদশাহী-ফর্সি এসে হাজির হল।

বাতায়ন পথে শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যায়। কুসুমকুমারীর সেই রক্তিম স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে নেশা ও ধোঁয়ার মেঘে। তার বার-মাসের সন্ধ্যা ও সকাল যেন কেঁদে কেঁদে ফিরে যায় বাতায়নে।

সোমেশ্বর বার্ধক্যে পা বাড়ালেন।

তিনি ভাঙ্গতে পারেন, কিন্তু মচকাতে পারেন না। হাতীশালার হাতী যাক, ঘোড়াশালার ঘোড়া, তবু তিনি মাথা নোয়াতে পারেন না। তিনি অতিরিক্ত চার্জ করতে লাগলেন প্রজাদের ওপর। বিশেষ করে নিকটের প্রজারাই ঘায়েল হতে লাগল, প্রথম যারা নেমেছিল তারই পক্ষে লাঠি নিয়ে। কেন তারা বাজে ব্যয়ের খরচ যোগাবে না? জমিদারী কি তাঁর একার, না ফল জল ফসলের মুনাফা খায় সকলে? সোমেশ্বর তো অভিভাবক মাত্র। মর্যাদা বজায় রেখে চলেছেন সকলের।

প্রজারা মাথা নত করে এসে দাঁড়ায়। ক্ষতচিহ্ন দেখায় বুকের। হুজুর মালিক।

আর্জি? হাকিঁয়ে দাও সনাতন আমার স্বমুখ থেকে।' বৃদ্ধের চোখ ঘোলাটে হয়ে গেছে তখন ক্রোধে।

প্রজারা স্তম্ভিত হয়ে খানিক চেয়ে থেকে চলে যায়। জটলা করে বসে বসে।

কি কারণে যেন ছোট হিস্যা মামলা ছাড়ল। সোমেশ্বর কানা-ঘুষা শুনলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নাকি আসছে, তারা মন দেবে ব্যবসায়। জেদের ভাত নাকি কুকুরেই খেয়ে যায়।

সোমেশ্বর আশ্বস্ত হলেন বটে, তবে তাঁর রক্তের জেদ পড়ল না। তিনি ভাঙা-চোরা টক্কর-খাওয়া জমিদারীর খানিকটা বেশ উঁচু দামে পত্তন দিয়ে দিলেন—অনেকটা বিক্রীর সামিল করে। তাঁর মাথায় নতুন প্ল্যান এল। তিনি এক ব্যবসায়ী বন্ধুর সঙ্গে দেখাও করলেন।

স্থির হল সোমেশ্বর বিদেশে যাবেন—অর্থাৎ ইয়োরোপ।

ফুল বাগিচার কথা হঠাৎ স্মরণ হল তাঁর জাহাজে বসে। এই তো অবকাশ। এই স্বযোগে অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফিরতে হবে বিদেশী নাম-করা গোলাপের। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স রাখতে হবে নানা স্থানে, যাতে করে অর্ডার দেওয়ার অপেক্ষা না রেখে তারা পাঠিয়ে দিতে পারে ফুল ভারতে। কত শত রকমারী ফুল আছে যে সে দেশে!

লবণাক্ত সমুদ্রের জলে রক্তাক্ত ফুলের পাঁপড়ি দেখতে পান সোমেশ্বর কয়েক পেগ বিলাতী মদ খেয়ে। একটু একটু গন্ধও যেন পাচ্ছেন ফুটন্ত গোলাপের। কুমুমের স্মৃতি—যেন বিস্মৃতিতেই ডুবেছিল এতদিন। তিনি কপালের দুটো রগ চেপে ধরলেন সজোরে।

বছরখানেক বাদেই তিনি ফিরে এলেন বিদেশ ঘুরে।

একেবারে সাহেবের মত স্যুট, সাহেবের চাল চলন। দেখে সকলে অবাক! ব্যবসায়ী বন্ধুর সঙ্গে একটা অংশীদারী দলিল রেজেষ্ট্রী হল পূর্বের কথামত। আপাততঃ বিদেশী মাল আমদানী করে গোপনে স্বদেশী ছাপ দিয়ে ভারতের বাজারে ছাড়তে হবে। বড় বড় মেশিন, ফ্যাক্টরীর সরঞ্জাম, মোটর ইঞ্জিন ইত্যাদি। তারপর বুঝে-স্থজে কারবার বাড়ান যাবে।

ব্ল্যাক মার্কেটের স্থবাস পাওয়া যাচ্ছে বাবুজী। নোটের তাড়া উড়বে হিন্দুস্থানের বাতাসে···দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রায় এসে পৌছেছে হামাদের ছুয়ারে···

এখন চাই একটি গোপন আড্ডা সহর থেকে একটু দূরে।

আলোচনা সভাটা যেন গোলাপী হয়ে উঠল ছুরন্ত আশায়—ব্যবসায়ী-বন্ধুর সংক্ষিপ্ত চারটি কথায়।

কয়েক মাস কেটে গেল বিদেশে চিঠি-পত্রের আদান প্রদান করতে। ব্যাঙ্কের মারফত টাকা পয়সাও জমা দিতে হল প্রচুর। ওদেশের রাঘব-বোয়াল কারবারীরা কিছুতেই এদেশের কোটিপতিদের বিশ্বাস করতে চান না মোটা অগ্রিম ভিন্ন। টাকার অঙ্ক যেখানে যত ভারী প্রেমও সেখানে তত উচ্ছল।

কোন কথায় কর্ণপাত করতে চায় না হৃতমান হতগর্ব বৃদ্ধ ইংরেজ সিংহের কাষ্টম শাবক টমসন। খাঁটি ব্লু ব্ল্যাড—মৃত্যুকালেও তাৎপর্যের হাসি হাসে। মরিসন জুনিয়ার। সোমেশ্বরের কানের কাছে এগিয়ে আসে মৌখিক ডিকসেনারী নিয়ে। বুঝিয়ে বলে সব।

তবু অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না এত বড় জয়েণ্ট কোম্পানীর বাঙালী ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের।

বিষয়টা অত্যন্ত জটিল—পরামর্শ সাপেক্ষ। সোমেশ্বর উড়ে আসেন কলকাতা এবং উড়েই ফিরে যান দিল্লীর মসনদে।

সারা আকাশ পথে তাঁর কানে বাজে শুধু একটি বিদায় ধ্বনি, রাম রাম বাবুজী!

বিষয়টা অত্যন্ত প্রাঞ্জল করে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় ঝানু পার্টনার। লাখ টাকার কাজ দশ হাজার মে হোবে—এই নয়া সড়ক।

সেই পথেই চলছেন সোমেশ্বর।

কাষ্টমের প্রাচীর ডিঙিয়ে এপার আসার জন্য বহুবার সোমেশ্বরকে ছুটোছুটি করতে হল দিল্লীর মসনদ পর্যন্ত। ফ্যাক্টরীর প্ল্যান ও ব্যবসার উদ্দেশ্য যে সার্বজনীন তাও প্রমাণ করতে হল সোমেশ্বরকে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে।—অর্থাৎ কিনা মোটা মুনাফাটাই ইয়োরোপিয়ান শিল্প-পতিদের কুক্ষিগত হচ্ছে, ওঁরা সামান্যই পাচ্ছেন, মাত্র দালালী। কিন্তু বন্ধনটা বিশুদ্ধ বৃহতেরই ঐক্য এবং মিতালি।

একদা যে তড়িতাংগী বাইজী ডুবে গিয়েছিল কাগজের সমুদ্রে, সেই যেন আবার ভেসে ওঠে ট্রাকৃটর, জিপ ও জাঁদরেল মেসিনের আগমনী সংগীত তরংগে।

মুখে পাকা কামরাঙা, বুকে পুঞ্জ পুঞ্জ ছুটি স্তব্ধ শতদল। গলায় হীরকখচিত নৌলখা হার—সদ্য উপঢৌকন।

খটাখট বোতলের কর্ক খোলার শব্দ হয়…

ফেনা উপচে পড়ে গেলাসে…

নির্ভিকা বাইজী উল্লাসে লাফিয়ে পড়ে কোলে। সিংহ-শাবকের

ছলো ছলো চাহনি হিংস্র হয়ে ওঠে। তারা এদেশ হয়ত শীগ্গিরই ছাড়বে—তাই এখন বেপরোয়া।

পরদিন জুনিয়ার মরিসন এগিয়ে দেয়, সিনিয়ার টমসন সই করে।

কাষ্টমের প্রাচীর ডিঙিয়ে জিপ, হাডসন, হয়ত দু-একটা উড়ো-জাহাজের টুকরাও উড়ে আসে।

সোমেশ্বর তাড়াতাড়ি দেশে ফিরলেন। ঘাসের জমিতে ফ্যাক্টরীও খাড়া হল মাঝারি রকম। মাল আসতে লাগল, আবার ছড়িয়েও পড়তে লাগল স্বদেশী মার্কা গায়ে নিয়ে ভারতের বাজারে বাজারে।

যুদ্ধের দৌলতে লাভ হল আশাতিরিক্ত।

জেদী জমিদার সোমেশ্বর মাঝে মাঝে বঙ্কিম কটাক্ষে চেয়ে দেখতেন ছোট হিস্যাদের দিকে। তারা এখনও এত ছোট রয়েছে যে, তাদের চেনা যায় না এই সার্বজনীন প্রণয়ের ক্ষেত্রে। সোমেশ্বর তাদের তুলনায় কত ধুরন্ধর! আবার কত বড় প্রেমিক! আমেরিকা, ইংলণ্ডের সঙ্গে তিনি প্রাণ মিলিয়ে চলেছেন!

ভোরের তারার মত ক্রমে ক্রমে ছোট হিস্যারাও একদিন মিলিয়ে গেল তাঁর সুমুখ থেকে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে এল। ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে টাকা আর ধরে না। সোমেশ্বর চিন্তা করে হাঁপিয়ে উঠলেন, এখন দেশের এবং দশের জন্য কি করা যায়? দায়িত্বের বোঝার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁর মগজটা টন টন করে উঠল।

কয়েকটা রাত তাঁর ঘুম হল না ভাল।

একদিন শীতের সকালে আচমকা চমকে গেলেন সোমেশ্বর। মুকুরে

প্রতিফলিত হয়েছে এক বৃদ্ধের মুখ! সত্যই এত বুড়ো হয়েছেন তিনি? এতগুলো খাঁজ পড়েছে তাঁর গালে ও কপালে?

স্মুখের জানালাটা ভাল করে খুলে দিতে হুকুম করলেন চাকরকে।

আর উপেক্ষা করার অবকাশ নেই, সময় নেই বৃথা ব্যয়ের।

কুসুমের কবিতা তাঁকে যত দ্রুত সম্ভব ফোটাতে হবে গোলাপের লোহিত রাগে। আর তারই পাশে গড়তে হবে অভ্রংলিহ শিল্পের সহর সোমেশ্বর-নগর।

সনাতন! সনাতন!

মহারাজ?

স্মুখের জমিগুলোর দখল নিতে হবে।

কি করে? ওগুলো যে অনুগত লেঠেল প্রজাদের।

ওদের আনুগত্যে এখনও কি তুমি বিশ্বাস করো?

করি—বিশেষ করে যখন তারা সোমেশ্বর চৌধুরীর কাছারীর প্রাচীর। আমি বেশী কিছু না জানলেও আশি বছরের ইতিহাস জানি। কত ঝড়-ঝাপটা আর বজ্রপাত হয়েছে, কিন্তু ও প্রাচীর ভাঙে নি, নড়েনি কোনদিন! প্রাচীন নায়েব অধীর হয়ে পড়েন।

হিমালয়ও নড়ে সনাতন।

কিন্তু তা মহারাজ পাথরের দুর্গ, আর এ যে মানুষের প্রাণের প্রাচীর। পুরুষ-পরম্পরায় ওরা আমাদের আশ্রিত, আর আমরা ওদের মনিব হলেও ওদের স্নেহ, মায়া, কৃতজ্ঞতায় ক্রীত।

অত অধীর হয়ো না সনাতন—এটা বিংশ শতাব্দীর মধ্যস্থল। পৃথিবীটাকে একটু অন্যভাবে দেখতে চেষ্টা করো।

আমি তা পারব না।

তবে ছুটি নাও।

কিছুদিনের মধ্যেই একজন ম্যানেজার এল—ইংরেজ নয় বিলাতী কেতাদুরস্ত।

অনায়াসেই লেঠেল প্রজাদের বসতিগুলো খালি হয়ে গেল। জমিগুলোর কেউ দাবীদার রইল না—ফসল সমেত খাসে চলে এল দুটো একটা আলপিনের খোঁচায়।

দেখতে দেখতে কয়েকটি মাস কেটে গেল কর্মব্যস্ততার ভিতর। তারপর দুটো বছর।

প্রথম সৃষ্টি হল কুসুমবাগ—বহু পূর্বেই পরিকল্পিত।

তারপরই সোমেশ্বর নগর…

ধীরে ধীরে মাথা খাড়া করতে লাগল দুটী একটি করে গগনস্পর্শী চিমনি…

ফুলগাছ এল বাগদাদ, বসরা থেকে পর্যন্ত। ফুলও ফুটল এদেশে, ঝরেও পড়ল পাঁপড়িগুলো, কিন্তু তবু যেন অফুরন্ত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার—খেয়ালী নারীর বাসনার কবিতা- শেষ হয়েও নিঃশেষ হতে চায় না।

সোমেশ্বর চৌধুরী মারা গেলেন। তাঁর পূতাস্থির রেণুর ওপর গড়া হল দিব্য মন্দির। কবি এল, ভাস্কর এল। উৎকীর্ণ করা হল প্রস্তর ফলকে কবিতা—

এখানে ঘুমিয়ে আছে কর্মবীর
সোমেশ্বর রায়
জনকল্যাণের তরে আজো যার
প্রাণ পুড়ে যায়!!

কুসুমকুমারী মারা গেছে অনেক কাল আগে, সোমেশ্বর মারা গেছেন সেদিন। কিন্তু মরল না টুরিষ্টের দল। তারা আসতে লাগল ঘুরে ঘুরে ভারত বিখ্যাত গোলাপ বাগ দেখতে।

এক পাশে উদ্যান অন্য দিকে নগর—যেন শাহান্‌শাহ সাহজাহানের পাশে মমতাজ বেগম কণ্ঠলগ্ন হয়ে রয়েছে চির অবিস্মরণীর নিদ্রায়। তারপর চোখ ফেরালেই শুধু দেখা যায় লাল খুন—না, না, রাশি রাশি রক্তিম কুসুম।

॥ বাঁদী ॥

পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে কিছু দেখা যাচ্ছে না—শুধু জল, বর্ষার ঘোলাটে ফোঁপানি, মাথায় ফেনার ফুল। এই আছে, এই নেই, আবার ছড়িয়ে পড়ল সহস্র সহস্র। যেমন ঝাপ্টা, তেমনি ঢেউ, তেমনি জন্মাচ্ছে রাশি রাশি ফুল। আকাশের দিকে স্তবকে স্তবকে ঠেলে উঠছে। বুঝি বা অভিনন্দন জানাচ্ছে মৌসুমী কালো মেঘকে।

অমাবস্যার দুর্দান্ত ভাটা। নদী তরংগ ঠেলে চলেছে দক্ষিণে, সমুদ্র-সংগমে। যে কখনও কানে শোনেনি, সে এ নদীর শব্দ, শোষানি, ঢেউয়ের মাতন দূর থেকে কল্পনাই করতে পারবে না। পূর্ব বাংলার মানচিত্রে যে সরু সরু নীল শিরার মত পদ্মা-মেঘনার শাখা নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে বঙ্গোপসাগরের দিকে, এ নদী তাদেরই একটি ভগিনী অথবা বেহায়া ননদ। নামটিও চমৎকার —ঠাকুরঝিতলার গাঙ।

পায়রা নদীর সবচেয়ে চওড়া বাঁকটা যেখানে এসে শেষ হয়েছে, যেখানে পঁচিশ ত্রিশ হাজার মণী মহাজনী ভরাগুলোকেও (বড় নৌকা) দেখায় ছোট ছোট শিশু পারাবতের মত, সেইখানেই দেখা ঠাকুরঝির সঙ্গে। শুধু বেহায়াপনা, কুটিল হাস্য। ভয়ে শিউরে ওঠে নৌকা যাত্রী। পৃথিবীতে কি কোথায়ও কূল আছে? স্থল আছে মানুষের স্বেচ্ছা বিহারের? বর্ষাকাল হলে তো কথা নেই, শান্তি নেই স্বস্তি নেই, শুধু অবিশ্রান্ত আতঙ্ক। একটানা গর্জন ঠাকুরঝির যদিও বা কখনও থামে, প্রমত্তা হয়ে ওঠে পায়রা।

উল্লাসে লোভানি, লাফানি ঠেলে দেয় আকাশে। ঢেউয়ের মাথা ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে হাজার হাজার আভের টুকরা। আবার তা মিলিয়ে যায় দেখতে দেখতে।

এমনি একটা বর্ষার দিনে ঠাকুরঝিতলার ভিতরে এক গঞ্জে একখানা আটমাল্লাই পান্‌সী বাঁধা। যাবে পায়রা নদীর একটু পাশ কাটিয়ে কোনও এক জমিদারী মহলে। জমিদার স্থলেমান সাহেব নৌকার খাস কামরায়। সঙ্গে তার এক তরুণী বিবি। বোধ হয় সপ্তম পক্ষের। বিবি এবং সাহেবের তদ্বির তদারকের জন্য একজন বাঁদীও এসেছে নায়ে। সেও বিবির তুলের তুল দেখতে। অবস্থা সাজ সাজসজ্জায় বৈগুণ্য না থাকলে কে যে বিবি. আর কে যে বাঁদী তা বোঝা কঠিন হত। দু'জনারই দাঁতের স্থমুখের পংক্তি হীরার মত। বিবির গালে তিল আছে, বাঁদীর গালের সে অভাব পূর্ণ করেছে ছোট্ট একটি টোল। হাসি তো মুখে লেগেই আছে সারাক্ষণ। তবে বিবি ও বাঁদীর হাসিতে পার্থক্য আছে প্রচুর। একজন হাসে খুশিতে, আর একজন খুশি করতে। আরও বৈষম্য আছে চাল-চলনে। একজন যখন আইনত দাবী করে শয্যা, আর এক জন তখন আশংকায় রাত্রি জাগে কখন হয় ধর্ষিতা। স্থলেমান মত্তপ অসংযমী।

ঠাকুরঝিতলার গাঙের প্রায় এক বাঁক ওপরে একটা ছোট খালের মধ্যে কয়েকখানা লম্বা ধরনের ডিঙি বৈঠা পুঁতে 'পারা' করে রেখেছে একদল ডাকু। তাদের নায়ের পাটাতনের তলে স্থতীক্ষ্ণ হাতিয়ারগুলি গোছান—রামদা, ল্যাজা, পাকা বাঁশের পোক্ত লাঠি। সড়কি এবং ঢালও আছে গণ্ডারের চর্মের।

মাঝিগিরি করে পেট ভরে না। এই তিন পুরুষ তো গত হল

বান্দা খেটে জসিমের। সে-ই 'খোজারু' সেজে খোঁজ দিয়েছে সুলেমান সাহেবের গতিবিধির।

ডাকুরা বড্ড ফাঁপরে পড়েছে। সুলেমান সাহেব নাও খুলছেন না। ওরাও কিছু করতে পারছে না। পায়রা নদীর পাশাপাশি না হলে তো কোনও জুত করার উপায় নেই। ওরা সাধারণ ধান-কাটা কৃষাণদের মতই রেঁধে বেড়ে খাওয়ার অভিনয় করছে। আর গালাগালি দিচ্ছে খোদাকে। বর্ষাকালে বাড়িতেও উপোস, খাটতে নেমেও তাই। শিকার ফাঁদে পা দিচ্ছে না।

ওদের ইচ্ছা করে নদীর মাতলামি একেবারে থামিয়ে দিতে—ঠাণ্ডা করে দিতে সেই শীতের গাঙের মত। যেন শীতল পাটি বিছান। কিন্তু গরিব যতই দুঃসাহসিক কাজে নামুক—তাদের ইচ্ছা মতই তো আর জমিদার নাও খুলবেন না।

বাঁদীর নাম আমিনা। সে এক ফাঁকে রসুই-খোপে এসে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল, 'নাও খুলবা কখন মিঞা?'

'যখন তোমার গাঙে ডুইবা মরার ইচ্ছা হইবে, কইও।'

'ওমা কয় কি! আমি মরুম ক্যান পানিতে ডুইবা—বুড়া হইছ তুমিই মর।'

'তয় গাঙের দিকে না চাইয়া কথা কও ক্যান? দেখ না আসমান-জমিন একাকার—ক্যাবল মাথা-ভাঙা ঢেউ।'

তা আমিনা দেখেছে। তবু ভাবছে, যত সত্বর কাছারী-বাড়ি দশজনের ভিতর যেতে পারে, ততই তার পক্ষে মঙ্গল। কি কুক্ষণে, কি বুঝে যে তার মা এই নায়ে তাকে তুলে দিয়েছিল!

আমিনা সবে মাত্র উনিশ বছরে পা দিয়েছে, এখনও কৌমার্য তার অক্ষত। সে প্রভুদের সমস্ত মহিমাই জানে, তাই একান্ত বিব্রত হয়ে পড়েছে।

আমিনা চেয়ে দেখল, কেমন জলের ঢলক খেলছে মাঝ দরিয়ায়। তারপর খানিকটা দূরে সে কি উন্মত্ত আস্ফালন! পায়রা নদী আর ঠাকুরঝি যেন গিলে খেয়েছে সমস্ত সবুজ তীর ও তট। অনেকক্ষণ চাইলে মাথা ঘুরে যায়। কূলহীন ঝড়ো সমুদ্র সে কখনও দেখেনি, কিন্তু এই বর্ষার কালো মেঘের পটভূমিতে যে গেরুয়া জলরাশি দেখতে পায়, তার চেয়ে যে ভয়ংকর কিছু আছে পৃথিবীতে সে তা ভাবতেই পারে না।

তবু বিমূঢ়ের মত সে খানিক বাদে মাঝিকে আবার জিজ্ঞাসা করে, 'নাও খোলবা না?'

মাঝি বিরক্ত হয়ে বলে, 'না। তোমার মত পাগল তো দেখি নাই এ জিন্দায়!'

প্রকৃতির খেয়াল-খুশি মানুষের অনুমানের বাইরে। অনিচ্ছুক মাঝিকেও হঠাৎ গাঙের দিকে চেয়ে নাও খোলার হুকুম জারি করতে হয়। 'সামাল, সামাল, বান আইছে ঠাকুরঝির বুক ভাইঙা। লঙর খোল, পারা তোল ইব্রাহিম, জসিম, কেরামৎ।'

সবাই মিলে লঙর-কাছি গোছায় আর ডাক ছাড়ে, 'বদর, বদর।' সিন্নি মানত করে পাঁচ পীরের দরগায়। খোদা ওদের যেন জান (প্রাণ) না যায়—ইজ্জৎ যেন বাঁচে বুড়ো মাঝির। সে জীবনে এমন বেকায়দায় পড়েনি কখনও।

আমিনা দেখল যে, ঠাকুরঝি পাগল হয়েছে, আর তার বুকের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসছে বেসামাল ঢেউ। সে কি তার তড়পানি!

নৌকা মাঝ দরিয়ায় আনা সম্ভব না হলেও কয়েক রশি ভিতরের

দিকে এসে অপেক্ষা করতে লাগল বানের ঢেউয়ের মুখোমুখি হওয়ার জন্য। এ-সময় নাকি পারে থাকা নিতান্ত বিপজ্জনক। তোড়ের ধাক্কায়, পারের ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে ওর চেয়েও হাজার গুণ শক্ত নৌকা।

আমিনা খাস-কামরায় এসে লক্ষ্য করল যে, বিবি সাহেব জড়িয়ে ধরেছে সুলেমান সাহেবকে। 'কই যান, বড় ডর করে আমার।'

'তা বইলা পেত্নীর মত ভয় করতে পারবা না। চুপ কইরা বইসা আল্লার নাম করো।'

আমিনা মনে মনে একটু না হেসে থাকতে পারল না। দায় ঠেকলে মাতালের মুখ দিয়েও বড় বড় কথা বের হয়। কিন্তু তাতে মন ভিজল না তো বিবি সাহেবার।

আমিনা নৌকার খাস-কামরার একটা নক্‌সি থাম ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

বানের ডাক ক্রমে কাছে এল।

যখন ঠাকুরঝির দু'পার ছাপিয়ে একেবারে কাছে এসে পড়েছে বান, তখন কি জানি কি ভেবে মাঝি হঠাৎ ঘুরিয়ে দিল পান্‌সীখানা। মুখোমুখি বানের ধাক্কা না নিয়ে, বানের উদ্দাম গতিকে আয়ত্তে আনল নায়ের পিছনের দিকে তুফান বাঁধিয়ে। ভেসে চলল পান্‌সী—উল্কার মত এগিয়ে চলল উত্তরে। পায়রা রইল অনেক দূরে পড়ে।

নায়ের গতি মন্দীভূত হয়ে এল প্রায় সাড়ে তিন বাঁক ওপরে গিয়ে। তার মানেই হচ্ছে প্রায় চার পাঁচ ক্রোশ।

এতখানি পথ আসতে কতটুকুই বা সময় লাগল! কিন্তু বেলা যে পড়ে এল। নিকটে কোনও মনুষ্য-বসতি নেই। থাকলেও তার বাসিন্দারা সম্পূর্ণ অপরিচিত। ভয় আছে ডাকাতি রাহাজানির।

'কি করবা রহমৎ?' মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন সুলেমান।

'হুজুর এইখানেই লঙর ফেলুম। হাজারটা হাতীতে হাওদা লাগাইয়া টানলেও এই উজানে নাও পিছাইবে না। গঞ্জে ফিরুম ভাটা হইলে।'

'কিন্তু···।'

আমিনা বুঝল মদ ফুরিয়েছে। যাক, বেশ হয়েছে।

আমিনার বাপ ও মা তেমন সুন্দর ছিল না। তেমন কেন মোটেই নয়। কিন্তু তাদের ঔরসে, কি করে জন্মাল এ স্বর্ণলতা? উদাহরণ দেখাতে গেলেই বলতে হবে, এ যেন বাদশাজাদী। উদাহরণ বস্তুটি কোন সময়েই সত্য নয়, তবে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য থাকে সত্যের সঙ্গে। কিন্তু আমিনার বেলা এটা ছিল নিছক সত্য। ওর পিতা ও মাতার মধ্যে একটা আইন-সম্মত সম্পর্ক ছিল স্বামী-স্ত্রীর, কিন্তু তা চিরাচরিত প্রথানুযায়ী হুজুর-বংশ মাঝে মাঝে নদীর উঠিত্ চ'রো জমির মত জবর-দখল করে ভোগ করতেন।

পুরুষটাকে খাটিয়ে নেওয়া হত যতদূর নেওয়া সম্ভব, আর মেয়ে-লোকটাকে তার সারা দিনমানের ক্লান্তির পর করা হত অতর্কিতে ভোগের সামগ্রী। কোর্মা-পোলাউ-এর মুখে কিছু টক-চাটনির তো দরকার।

এমনই একটা টক-চাটনির পরিণতি আমিনা।

তা হক, তবু সে সুন্দর, মায়া হয় দেখলে—আর জ্বালা হয় সমস্ত তলিয়ে ভাবলে।

ধাক্কায় ধাক্কায়, অশিক্ষায়, অপব্যবহারে আমিনার মা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে যে চোখে দেখতে পেত না, তা নয়—অন্ধ হয়েছিল তার মনের চোখ। তাই সে সুলেমান সাহেবের খাস বাঁদী করে দিয়েছিল

মেয়েকে। বলেছিল, 'নয়া (নতুন) শাদি হইলে কত কান্দে, হ্যাষে বাপের ঘরের কথা ভুইলা যায়। বছর অন্তর একবার আসে কি আসে না। তুই যে আজ কান্দিস আমিনা, কাইলই হয়ত যাবি এ বুড়ী মায়েরে ভুইলা। কত দেখলাম, আমার বয়স হইল দেড় কুড়ি।' ধারাপাতের ওপর সামন্য একটু অধিকার না থাকলেও বুড়ী অশ্রু বিসর্জন করে কি যেন এক সুমহান্ অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকায়। এবং তা সে বাধ্য হয়ে সৃষ্টি করল নিজেই। কুড়াল দিয়ে অনেকেই কোপ মারে কিন্তু যে নিজের পায়ে কোন দিন আঘাত করেনি, সে বুঝতেই পারবে না আমিনার মা'র মর্মব্যথা।

আমিনা খানিকটা মন-মরা হয়ে নায়ে উঠে গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে মাকে ভুলবে না কিছুতেই। আর এর জন্য প্রতিজ্ঞার কি-ই বা প্রয়োজন? তার চারিদিকে যে বিপন্না এক বুড়ী মায়ের অশ্রু-সজল মুখখানা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না! যত বার সে চোখ মুচছে কেবলই দেখছে ঐ একই ছবি। নদী, জল একাকার।

সন্ধ্যার একটু পরেই ঢিমিয়ে এলো পূবো হাওয়া। জলের শোষানি গর্জানিও সেই সঙ্গে কমে এল। বাতি জ্বলল প্রত্যেক কামরায়। রান্না-বান্নার যোগাড় হল, হাতিয়ার নিয়ে হুঁসিয়ার হয়ে রইল পাইক পাঁচ জন।

'আমিনা একটু সরাব দে।'

'বোতল খালি হুজুর।'

বোতলের মালিক তা জানতেন ভাল করেই। তবু কেন যেন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোদের আর খেয়াল হইবে কবে। এখন পানি ঢাল বোতলে!'

সুরাগন্ধী জল এল রূপার গ্লাসে। তাও কতকটা সুরার সামিল।

বোতল ছিল অনেকগুলোই খালি। কিন্তু তেমন ক্রিয়া হল না। তবু কিছুটা বেসামাল ভাব দেখাতে লাগলেন সুলেমান সাহেব।

'যদি এখন আইসা ডাকাইতে ধরে আমাগো ?'

নতুন বিবি একেবারে কাতর হয়ে পড়ে। 'খোদার কসম চুপ করেন।'

'যদি চায় তোমারে ?'

'আল্লা গো!' আর্তনাদ শোনা যায় বামা-কণ্ঠের।

নয়া বিবির মুখের দিকে তাকিয়ে একটা পাশবিক আমোদ উপভোগ করেন সুলেমান।

এই সূত্রে একটা ছোট ঘটনা মনে পড়ে আমিনার।

সুলেমানের মা এক বাটি দুধ রেখেছিল এক দিন জ্বাল দিয়ে। বাড়ির পাশের এক উদ্বাস্তু কৃষাণের বিড়াল এসে খেয়ে গেল সেই দুধ। পরদিন ওৎ পেতে রইলেন সুলেমানের মা একখানা বঁটি হাতে করে। শীর্ণ বিড়ালটা আর কাছে ঘেঁসল না। দূরে বসে মেঁউ মেঁউ করতে লাগল। তখন বদ-মেজাজী সুলেমানের মার মাথায় একটা অদ্ভুত নেশা চাপল। তিনি ভিন্ন ঘরের জানালা গলিয়ে খানিকটা গরম ফ্যান ছিঁটকে দিলেন বিড়ালটার গায়। বিড়ালটা চকিতে সামলে নিল —কিন্তু গরম তাপের ভয়ে সে আর্তনাদ করে পালাল।

শৈশবে আমিনা যা প্রত্যক্ষ করেছে, এখনও তার তা ঠিক মনে আছে।

সুলেমান আবার বলতে লাগলেন, 'চিল্লাও ক্যান? একটু রস-তামাসাও বোঝ না। ডাকুর হাতেই যদি দিমু, তবে সাদি করলাম কেন সখ কইরা ?'

নয়া বিবি কথা বলে না। যেন তার বিশ্বাস ফিরে আসছে না।

'তুই কি কও আমিনা? এতগুলো বৌ থাকতে আবার সাদি করলাম ক্যান? কি, জবাব দে, ডর নাই—দিল-খোলা কথা ক'।'

আমিনা প্রভুর চোখের দিকে বারেক তাকিয়ে বলে, 'খুশি হইলে আপনারা তো হুজুর কুকুর-ছাও কেনেন।'

'কি হারামজাদী, যত বড় মুখ-না তত বড় কথা! বন্দুকডা কই, আমার দোনালাডা?'

এ স্থলেমান সাহেবের ঠাট্টা না সত্যি মেজাজ, বোঝা গেল না। অর্থাৎ কিনা বুঝতে সময় দিল না, সত্যিকারের ডাকুর দল। তারা 'মার-মার' করে ঘিরে ধরল পান্‌সী। মুখে তাদের মুখোসের মত কাপড় জড়ান।

বন্দুকে টোটা ভরলেন স্থলেমান সাহেব। সামান্য নেশার ঝোঁক তিনি কাটিয়ে উঠে বাদশাহী মেজাজে খাড়া হলেন। শেরের মত পা ফেলে ফেলে বাইরে বের হলেন; কামরার ভিতর রইল বাঁদী ও নতুন বিবি। কিন্তু শের ফেউ ব'নে গেল উপোসী ডাকুর সংখ্যা ও হিম্মত দেখে। এর মধ্যেই তারা মাঝি-মাল্লাদের কাবু করেছে হাত-পা বেঁধে। খোজারু জসিমের পাত্তা নেই।

'তোমরা কি চাও?'

'টাকা।'

স্থলেমান সাহেব কয়েক তাড়া নোট ছুঁড়ে দিলেন।

'আর কি?'

'গয়না।'

একটা সোনার অলংকার বোঝাই বাক্স ঠেলে দিলেন স্থলেমান।

'এখন আবার কি চাও—খাড়াইয়া রইছ যে?'

'আজ্ঞা গয়না পরবে কেডা?'

সুলেমান সাহেব চিন্তিত হলেন। বলে কি এরা?

'ভাবেন কি হুজুর, আপনার কত বিবি আছে, এই নতুনডিরে মেহেরবানী কইরা খয়রাৎ (ভিক্ষা) দেন।'

'তা হইবে না।'

পূর্বের মতই ছোকরা সর্দার উত্তর দেয়, 'এ তো পাঠার ইচ্ছায় ল্যাজে কোপ না। ডাকাইতের খাতায় নাম লেখাইয়া, লুটের সেরা মাল ফেইলা যামু না। গয়না হুজুর, পরবে কে? ময়না না হইলে খাঁচায় বইসা নাচবে কে?'

সুলেমান আর বাক-বিতণ্ডা না করে ভিতরে চলে যান এবং উজ্জ্বল মশালের আলোকে যার চুলের মুঠি ধরে ঠেলে ডাকাতের হাতের তুলে দেন, তাকে দেখে হকচকিয়ে যায় ডাকুর দল। এ কি বেহেস্তের পরী?

কিন্তু নৌকায় নিয়ে গিয়ে তার মুখ বাঁধতে হয়। হাত-পা বাঁধার প্রয়োজন হয় না—চারদিকে জল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাকাতের নৌকাগুলো মিলিয়ে যায় উড়ন্ত পাখির মত অন্ধকারে।

সুলেমান দাঁতে দাঁত ঘষেন রাগে দুঃখে অপমানে।

নৌকাগুলো চলতে চলতে এক স্থানে এসে থেমে পড়ে। নদী নয়—ঠাকুরঝির উজান বাঁক শেষ হয়েছে এই কিছুক্ষণ—নদীর শামিল খাল। যেমন নির্জন, তেমনি ঘিঞ্জি গাছপালা, লতা-বেতসে দু'পার ঠাসা। বড়-ছোট সব গাছই একাকার—শুধু নিবিড় ঘন কালি। জোনাকি জ্বলছে হীরার মত। পোকা-মাকড়, বন্যজন্তু ছাড়া অন্য কিছু যে এখানে আছে, তা ভাবাই যায় না।

লুণ্ঠনের সমস্ত সামগ্রী ভাগ হয়ে গেল। শুধু কিছু টাকা গচ্ছিত রইল ছোকরা সর্দারের হাতে মামলা-মকর্দমার ব্যয়ের আশংকায়। অন্যত্র

অনেক ঠকাঠকি হয়, কেউ গোপন করে সোনার হার, কেউবা টাকাকড়ি—কিন্তু রমজানের দলে সে সব হওয়ার জো নেই। তাই অল্প বয়স হলেও রমজানকে ভক্তি-বিশ্বাস করে বয়স্ক ডাকুরা।

একটি মাত্র বিবি, অনেক দিন পরে পাওয়া গেছে, কেউ আর সেদিকে নজর করল না। সেরা মাল সর্দারেরই ভাগে থাক। ও নিয়ে কি ঝামেলা কম! যদি বাধ্য না হয় তবে অতিষ্ঠ হয়ে যেতে হবে অত্যন্ত ধৈর্যশীলকেও। কোথায় গুম্ করে রাখা—আবার কে দেখে, কার কাছে ফাঁস করে দেয় যত গোপন তথ্য। সেই জন্য সুন্দরী হলেও দায়িত্বের বোঝা রইল, যে বোঝা বইতে পারবে তার কাঁধে।

'মিঞা, সেলাম—দেখা হইবে পরশু বিহানে ঠাকুরঝিতলার হাটে।'

'সেলাম, থাইক সাবধানে। সুলেমান সাহেব কিন্তু সহজ মুনিষ্য না।'

আপাতত কিছু লাভ হলেও ওরা একটা অতি গুরুতর আশংকা নিয়ে যে যার বাড়ির দিকে নাও খুলল।

জনহীন জংলা খালের পারে নিবিড় অন্ধকারে একটি অপরিচিতা নারী ও একটি পুরুষ একখানা ছোট্ট নায়ে রয়ে 'গেল—যাদের ভিতর কোনও প্রেম নেই, পরিচয় নেই, শুধু সাপে-নেউলে সম্বন্ধ।

ধৃতা বিবি ভাবছে: আর কি, এখন দেবে মুরগীর মত গলায় ছুরি বসিয়ে—বিসমিল্লা ব'লে।

ডাকুর সর্দার স্থির করেছে: ও ছাড়া পেলে দেবে ফাঁসি কাঠে যে-কোন উপায়ে লট্‌কে।

পূবো-হাওয়া একটু কমেছিল, আবার বেড়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ষা। এখন আরও নিবিড় সোঁতা খাল দরকার। এত মেহনতের পর আর এ জল সহ্য হয় না। রমজান বৈঠা তুলল। ঐ অন্ধকারেই একটা সোঁতা খালে গিয়ে ঢুকল।

এক পসলা বৃষ্টি ঝরে আকাশটা একটু পরিষ্কার হল।

কেন জানি একটু আলাপ করতে ইচ্ছা হল রমজানের।

একটা মালা দিয়ে নায়ের জল ফেলতে ফেলতে ডাকু জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি বিবি?'

কি যেন জবাব এল কিন্তু বোঝা গেল না। মুখের কথা কাপড়ে জড়িয়ে গেল।

ডাকু বিবির মুখের বাঁধন খুলে দিল। ভয় কি? যাবে কোথায় এই আঁধারে জল-ঝড়-কাদায়?

'এক গেলাস পানি খামু।'

এত জল ঝরল তবু তৃষ্ণা! মমতা হল ডাকুর। কেন একে বেঁধে রেখেছে এতক্ষণ?

'গেলাস তো নাই।' একটু লজ্জা বোধ করল ডাকু।

'আচি (মালা) ভইরাই দেন।'

ডাকু এক মালা জল দিল নদী থেকে তুলে। 'খাও।'

জল খাওয়া শেষ হলে রমজান ফের জিজ্ঞাসা করল, 'বিবি তোমার নাম?'

'আ-মি-না।' তিনটি অক্ষর একটু ভাগ করে টেনে টেনে বলল বিবি।

'তুমি না? কও কি তুমি না?'

একটা দিয়াশলাইর কাঠি জ্বালাল ডাকু।

'আমি বিবি না—বান্দী, আমার নাম আমিনা। আপনারে ঠকাইছে মিঞা।'

'সত্য না কি?'

'দেখেন এখন নোটগুলা জাল কি না—ছাহেব বড় ধড়িবাজ।'

আরও গোটা তিনেক কাঠি জ্বেলে ভাল করে আমিনার মুখখানা দেখে রমজান বলল, 'না তা পারে নাই।'

প্রগলভা আমিনার চোখের পাতা সন্নত হয়ে এল। এ তো ডাকুর ভাষা, ডাকুর দৃষ্টি নয়। আমিনা জাত-বাঁদী। প্রেমের বেসাতি করার ওদের বড় একটা সুযোগ হয় না। কিন্তু বেসাতি করে ঠকতে জিততে এমন কি মরতেও দেখেছে অনেককে।

আবার দমকা পূবো-হওয়া এল। এল জলের ঝাপটা যেমন আসা উচিত। রমজান উঠে নাও সামলাতে গেল। আমিনা বসে রইল খানিকটা শুকনো জায়গা খালি করে দিয়ে। রমজান তো আর বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজবে না। ছৈয়ের ভিতর এসে বসবে কোথায়?

'কিছু খাবা না?'

এ কি আপ্যায়ন! গলায় তো ছুরি দিল না।

'আছে কি?'

'পানি-পান্তা।'

'সেই সক্কালের? ও আমাগো মুখে রোচে না।'

রমজান হাসে। 'তুমি সত্যই বান্দী। ক্যাবল বান্দী না বেহায়া। কোনও নয়া বিবির এমন মুরদ হইত না রমজান সর্দারের সাথে মসকরা করতে। তুমি তাজ্জব (আশ্চর্য) কইরা দিলা। কি, কিছু খাবা না কি?'

আমিনা চুপ করে থাকে।

রমজান একটা লম্ফ জ্বালায়। বাতাসের ভয়ে আড়াল করে রাখে একখানা পাটাতনের তক্তা দিয়ে। গলুই খোপ থেকে একটা মেটে বাসনে ভাত তোলে সযত্নে। 'কি, খাবা না কি চারডি—আমার কিন্তু প্যাট জ্বইলা যায়।'

ভাতের পরিমাণের দিকে একবার তাকিয়ে আমিনা বলে, 'আমি খাইছি সাঁঝের ওক্তে।'

'ভাল···আমার দোষ নাই কিন্তু···।'

'না,—না—এখন তাড়াতাড়ি খাইয়া লম্ফটা নিভান গুণমন্ত।'

কথাটা ঠিক। রমজান গোগ্রাসে গিলতে থাকে ভাত।

আর আমিনাও এতক্ষণ বাদে উজ্জল আলোকের সুযোগ পেয়ে কি যেন গিলতে থাকে দু'চোখ ভরে।

রমজান যত সত্বর সম্ভব খেয়ে লম্ফটা নিবিয়ে দিল এক ফুঁতে। আমিনা যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে জেগে উঠে কাপড়-চোপড় সামলে বসল। কি লোভনীয় স্বপ্ন দেখছিল তা সে-ই জানে। রামদা ও ল্যাজার সুতীক্ষ্ণ ফলার কাছে বসে, এক আসন্ন মৃত্যুর কথা ছাড়া আর কি-ই বা ভাবা চলে ?

তবু আমিনা ভাবছিল : ডাকুর সঙ্গে কি ভাব হয় না ? কেমন বলিষ্ঠ দুর্ধর্ষ। আবার কত নরম মন। যেন কেয়া কাঁটার ভিতর বাদলা ভিজা সুগন্ধ।

'বিবিজান খাইলা না তো ঘেন্না কইরা, এখন শুইবা না ?'

'ঘুম আইলে তো।'

'আইবে ক্যামনে ? খালি প্যাটে কি নিদ আসে ? তখন কইলাম খাইতে, অরুচি জন্মিল—এখন কেমন ঠেকে ? তোমার লগে (জন্যে) আমিও পারুম না শিথানে মাথা দিতে।'

'যদি মিঞা আমি ঘুমের ভান কইরা চুপচাপ থাকি চক্ষু বুইজা ?'

'ভান করতে চাও, ভান—কার কাছে ? ল্যাজা দেখছ নি ?' সত্যই ল্যাজার ডগার একটা খোঁচা দেয় রমজান আমিনার গায়।

'উঃ! মা গো!' শিউরে উঠে আমিনা সরে বসে।

'বেল্লিকের মত চিল্লাইও না, অত জোরে দাগা দেই নাই। দেখি একখান হাত দাও।' আমিনার একখানা হাত জোর করে টেনে এনে রমজান পীড়ন করতে লাগল। 'আমার নিদ্ আইছে, যদি পালাও তয় মতিচুর কইরা ছাড়ুম।'

নির্বাক্ আতংক ও বিস্ময়ে আমিনা চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ বাদেই নাকের ডাক শোনা গেল রমজানের।

বন্দিনী আমিনার বড় ইচ্ছা হল পালাবার। সে ঝটিতি হাত ছাড়িয়ে নেবে। ভাবল লাফিয়ে পড়বে, তার পর দুরন্ত সাঁতার।

কিন্তু কোন্ কূলে গিয়ে উঠবে সে? এক পারে মদ্যপ সুলেমান—অন্য পারে ক্রোধান্ধ রামদা হাতে এক ডাকুর সর্দার। নাম রমজান। রমজানের মধ্যে তবু সে ইতিমধ্যেই যেন দেখতে পেয়েছে একফালি কোমল উজ্জ্বল চাঁদ, কিন্তু সুলেমানের ভিতর তো শুধু অন্ধকার—দোজকের কালি। আমিনা কিছু স্থির করতে পারে না।

তার আবার লিপ্সা হয় পলায়নের। এ যেন একটা অন্ধ সংস্কার।—সত্য নয়, অথচ সুদৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু কি করে পালাবে?

ঘুমিয়েই তো পড়েছে রমজান। নাকের ডাক শোনা যাচ্ছে একটানা। যদি ভান হয়? আমিনা যে চাতুর্যের আশ্রয় নিতে চেয়েছিল, এ যদি তাই হয়? পরীক্ষা করে দেখতে চায় বন্দিনীকে?

পরীক্ষা নয়, সত্যই মুক্তি—দৃঢ় মুষ্টি শিথিল হয়েছে ডাকুর। আমিনা উঠবে—উঠে অন্তত খাল-পারের জংগলা ঝাড়ে আত্মগোপন করবে? ...কিন্তু সুলেমানের মূর্তি দেখা যায়। আমিনা তার শাড়িতে জড়িয়ে একেবারে পড়ে গেল রমজানের গায়ের ওপর।

ছিঃ! ছিঃ! সে করল কি?

'ভাবছ কি বিবিজান—'ডাকু দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল

ভাতের পরিমাণের দিকে একবার তাকিয়ে আমিনা বলে, 'আমি খাইছি সাঁঝের ওক্তে।'

'ভাল···আমার দোষ নাই কিন্তু···।'

'না,—না—এখন তাড়াতাড়ি খাইয়া লম্ফটা নিভান গুণমন্ত।'

কথাটা ঠিক। রমজান গোগ্রাসে গিলতে থাকে ভাত।

আর আমিনাও এতক্ষণ বাদে উজ্জল আলোকের সুযোগ পেয়ে কি যেন গিলতে থাকে দু'চোখ ভরে।

রমজান যত সত্বর সম্ভব খেয়ে লম্ফটা নিবিয়ে দিল এক ফুঁতে। আমিনা যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে জেগে উঠে কাপড়-চোপড় সামলে বসল। কি লোভনীয় স্বপ্ন দেখছিল তা সে-ই জানে। রামদা ও ল্যাজার সুতীক্ষ্ণ ফলার কাছে বসে, এক আসন্ন মৃত্যুর কথা ছাড়া আর কি-ই বা ভাবা চলে?

তবু আমিনা ভাবছিল: ডাকুর সঙ্গে কি ভাব হয় না? কেমন বলিষ্ঠ দুর্ধর্ষ। আবার কত নরম মন। যেন কেয়া কাঁটার ভিতর বাদলা ভিজা সুগন্ধ।

'বিবিজান খাইলা না তো ঘেন্না কইরা, এখন শুইবা না?'

'ঘুম আইলে তো।'

'আইবে ক্যামনে? খালি প্যাটে কি নিদ আসে? তখন কইলাম খাইতে, অরুচি জন্মিল—এখন কেমন ঠেকে? তোমার লগে (জন্যে) আমিও পারুম না শিথানে মাথা দিতে।'

'যদি মিঞা আমি ঘুমের ভান কইরা চুপচাপ থাকি চক্ষু বুইজা?'

'ভান করতে চাও, ভান—কার কাছে? ল্যাজা দেখছ নি?' সত্যই ল্যাজার ডগার একটা খোঁচা দেয় রমজান আমিনার গায়।

'উঃ! মা গো!' শিউরে উঠে আমিনা সরে বসে।

'বেল্লিকের মত চিল্লাইও না, অত জোরে দাগা দেই নাই। দেখি একখান হাত দাও।' আমিনার একখানা হাত জোর করে টেনে এনে রমজান পীড়ন করতে লাগল। 'আমার নিদ্ আইছে, যদি পালাও তয় মতিচুর কইরা ছাড়ুম।'

নির্বাক্ আতংক ও বিস্ময়ে আমিনা চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ বাদেই নাকের ডাক শোনা গেল রমজানের।

বন্দিনী আমিনার বড় ইচ্ছা হল পালাবার। সে ঝটিতি হাত ছাড়িয়ে নেবে। ভাবল লাফিয়ে পড়বে, তার পর দুরন্ত সাঁতার।

কিন্তু কোন্ কূলে গিয়ে উঠবে সে? এক পারে মদ্যপ সুলেমান— অন্য পারে ক্রোধান্ধ রামদা হাতে এক ডাকুর সর্দার। নাম রমজান। রমজানের মধ্যে তবু সে ইতিমধ্যেই যেন দেখতে পেয়েছে একফালি কোমল উজ্জ্বল চাঁদ, কিন্তু সুলেমানের ভিতর তো শুধু অন্ধকার— দোজকের কালি। আমিনা কিছু স্থির করতে পারে না।

তার আবার লিপ্সা হয় পলায়নের। এ যেন একটা অন্ধ সংস্কার। —সত্য নয়, অথচ সুদৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু কি করে পালাবে?

ঘুমিয়েই তো পড়েছে রমজান। নাকের ডাক শোনা যাচ্ছে একটানা। যদি ভান হয়? আমিনা যে চাতুর্যের আশ্রয় নিতে চেয়েছিল, এ যদি তাই হয়? পরীক্ষা করে দেখতে চায় বন্দিনীকে?

পরীক্ষা নয়, সত্যই মুক্তি—দৃঢ় মুষ্টি শিথিল হয়েছে ডাকুর। আমিনা উঠবে—উঠে অন্তত খাল-পারের জংগলা ঝাড়ে আত্মগোপন করবে? …কিন্তু সুলেমানের মূর্তি দেখা যায়। আমিনা তার শাড়িতে জড়িয়ে একেবারে পড়ে গেল রমজানের গায়ের ওপর।

ছিঃ! ছিঃ! সে করল কি?

'ভাবছ কি বিবিজান—'ডাকু দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল

তার চঞ্চলা প্রগলভা শিকার। 'চালাকি করতে চাও আমার সাথে ?'

আমিনা দুরু-দুরু বুকে মিথ্যা কথা বলল গুটিকয়েক, 'আমি তো পালাই নাই মিঞা।'

'তবে চুপ কইরা থাকো।'

ভয়ে লজ্জায় চুপ করেই রইল আমিনা। অন্ধকারে, নির্জনে নীরবে সাজা খাটল একটু পূর্বের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য। কিন্তু কেন জানি ভালই লাগল—স্বাদ পেল অগাধ। আনন্দ পেল অপূর্ব।

একটা অসহ্য পুলকে ব্যথায় সারা রাত ঘুমাতে পারল না আমিনা। রমজানের চোখেও ঘুম এল না। কত দুশ্চিন্তার ভিতরও কি যেন অনাস্বাদিত সুখ পেয়েছিল সে।

দু'জনে ধীরে ধীরে কথা হল অনেক। যে ভারসাম্য নির্দেশের কাঁটাটা দোদুল দুলছিল দু'জনার মধ্যে তা একটা কেন্দ্রে এসে স্থির হয়েছে। একজন অপরকে সাহস করছে ভরসা করতে। আমিনা যতটুকু পরিচয় পেয়েছে রমজানের, তাতে বুঝেছে যে, রমজান নিতান্তই ডাকু নয় এবং রমজানও বুঝেছে যে, আমিনাও একান্তই বাঁদী নয়। ওরা উভয়ে ঘোলা জলে পড়েছে কি যেন চক্রান্তে।

'বাড়ি যাইবেন না ?'

'যামু তো—কিন্তু একটু সবুর করো।'

'ফয়জরের (ভোরের) তারা যে দেখা যায় আসমানে।'

'কইলা কি—ভোর হইছে !' রমজান উঠে বসে। আবছা আলোতে একটা আতংক-বিহ্বল ছায়া দেখা যায় তার মুখে। যে দিনের আলোর জন্য জগৎ উন্মুখ, সেই আলোর ভয়ে যেন রমজান অস্থির।

'অমন করেন ক্যান মিঞা ? কি হইছে ?'

'কিচ্ছু না। দেখলাম যে বিহানের আর কত বাকী। এখনও দেরী আছে ঘড়ি খানেক।'

'বাড়ী যাইবেন কখন?'

'যামু তো—কিন্তু এখন আর সময় নাই যে।'

'তয় থাকবেন কই?'

'এই খালেরই চৌদ্দ বাঁক উপরে এক জংগলে। চলো, দেইখো কোনও কষ্ট হইবে না।'

'না হইলেই ভাল। কিন্তু—'

'তা যদি গোছল (স্নান) করতে হয়, এইখানেই সাইরা লও।'

'আপনে একটু আবডালে যান।'

রমজান কূলে উঠে অদৃশ্য হয়ে রইল।

স্নান সেরে আমিনা নায়ে গিয়ে একখানা শাড়ি পরল বেশ দামী। এবার আর তফাৎ রইল না বিবির সঙ্গে। রূপ তো ছিল তার অসামান্যই।

'ভাগ্যে আমি শাড়ি আনছিলাম ক'খানা, না হইলে পরতা কি?'

'দিতেনই যা হউক যোগাড় কইরা। মাইয়া লোকের সরম আব্রুর ভার তো পুরুষ মানুষের উপর।'

'আমি কি তোমার পুরুষ মানুষ?'

'জানি না।' একটা ঝামটা মারে আমিনা।

'কিছু জান না, কিন্তু রইলা তো বুকে শুইয়া।'

'এখন দেইখা শুইনা পথ চলেন—যেন উছাট (হোঁচট) খান না মধ্যে পথে। বেইল হইল যে।'

নাও ঠেলতে ঠেলতে রমজান সোঁতা খালের আগার দিকে এগিয়ে চলে। 'উছাট খাওয়া আমার তোমার হাতে না আমিনা।'

'তয় কার হাতে মিঞা? যত মুস্কিল তত আসান। খোদার বিচার এক তরফা না।'

একটা ব্যঙ্গ হাসি হাসে রমজান।

আমিনা দুঃখিত হয়।

কিন্তু চলন্ত নৌকা ঠিকই চলে এগিয়ে। প্রগতি অব্যাহত চিরদিন।

রমজান বার বার শাড়িপরা আমিনার দিকে তাকায়। কি যে রমজান ভাবে, কি যে সে দেখে তা যেন বুঝেও বোঝে না আমিনা। কিন্তু গৌরব অনুভব করে মনে মনে। এতদিন জমিদার-বাড়ির সংস্পর্শে থেকে সে যে আনন্দ না পেয়েছে, তার সহস্র গুণ আনন্দ উপভোগ করে এই ছোট্ট নায়ের ভিতর বসে। স্মরণ হয় মা'র কথা। দিন আসুক, সুযোগ আসুক, সে সমস্তই দেখাবে মাকে। কিন্তু সেদিন কি আসবে তার নসিবে? বুড়ো মা, ক্ষমতাপন্ন জামাইএর ঘরে চারটি সুখের অন্ন খেয়ে ধীরে-সুস্থে বয়স পেয়ে কি চোখ বুঁজবে? এত আশংকার মধ্যে এ যে আকাশের চাঁদ হাত বাড়িয়ে ধরার কল্পনা।

কি ভাবছে আমিনা? এ কি স্বপ্ন দেখছে সে দিনের বেলা জেগে জেগে।

'মুখখানা কালা কইরা বইসা রইছ ক্যান? ক্ষিধা পাইছে বুঝি খুব?'

'না।'

'ডাঁড়াও ক্যান?'

'না গো না।'

'তয় বুঝি মনে পড়েছে মায়ের কথা?'

এবার সজল হয়ে ওঠে আমিনার চোখের পাতা।

'বোঝলাম বোঝলাম, আমরা তোমাগো কেও না। তা মিথ্যা কি সাচ্চাই তো মা। দশ মাস দশ দিন...তা তো সত্যই।' রমজানের

প্রচ্ছন্ন হিংসাটা একেবারে এমন ভাবে প্রকাশ পায়—যেন পলাতক বালকের হাত থেকে একটা কৌটার ঢাকনি খুলে পড়ে গেল খানিকটা মিষ্টি সামগ্রী।

আমিনা অপ্রস্তুত হয়ে চেয়ে থাকে।

একটা অতি নির্জন স্থানে গাছ-পালার নীচে এসে নৌকা থামে। সোঁতা খাল এখানে একেবারই সরু হয়ে গেছে। এপার-ওপার ডিঙিয়ে পারাবার হওয়া যায় অনায়াসে। নিতান্ত প্রয়োজন না থাকলে মানুষ কখনও এখানে আসতেই পারে না।

কূলে উঠে কয়েকটা পাকা পেঁপে ও জামরুল নিয়ে এল রমজান। ওগুলো রেখে সে আবার গেল কূলে। এবার নিয়ে এল ঝুনো নারকেল দু'টো পেড়ে। যত তাড়াতাড়ি আসা উচিত ছিল, তার চেয়ে অনেক দ্রুত সে ফিরে এল।

'আপনে মিঞা কি বান্দর? গাছে ওঠলেনই বা কখন আর পাইড়া আনলেনই বা কখন?'

'সে কথা শুইনো পরে—আগে খাইয়া লও।'

দু'জনে একত্র হয়ে ফলগুলো পেট ভরে খায়। আমিনা একেবারে তৃপ্ত হয়ে গেছে।

'বিবিজান আমার মুখের দিকে একটু চাও।'

এমন করে অনুরোধ করলে আমিনার মত প্রগলভারও চোখের পাতা বুজে আসে, গলার স্বর যায় বন্ধ হয়ে। সে তাকাতেও পারে না, কিম্বা কিছু বলতেও পারে না।

'কই বিবিজান চাইয়া দেখবা না? সত্যই কি আমি বান্দরের লাখান (মত) দেখতে? মুখটা কি আমার তোমার মতই লবণ-পোড়া?' গভীর আবেগে রমজাম একটা চুমো খায়।

আমিনা সব্রীড়া কটাক্ষে তাকায়। কোনও জবাব দেয় না। কিন্তু এক সময় ধীরে ধীরে প্রতিবাদের ছলে বলে, 'লবণ-পোড়া ছালুন না চাখলেই হয়!'

যেন শুনেও শোনেনি রমজান, 'কি কইলা কি?' আবার সে সাগ্রহে চেখে দেখে নুন-কটা ব্যঞ্জন।

'সাধে কয় ডাকাইত? পুলিশ ডাকমু?'

আবার জরিয়ে ধরে রমজান। 'ডাকো না?

আমিনা তার গায়ে এলিয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কখন যাইবেন মিঞা বাড়ি?'

যামু তো, কিন্তু...

আমিনা যে এক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণ একেবারে বুঝতে পারে না, তা নয়। তবু তার ঔৎসুক্য হয় অত্যন্ত। কেমন ঘর, কেমন দুয়ার কেমনই বা মিয়ার পাড়া-পড়শী? প্রিয়জনের নিকট-পরিচয় আমিনা পেয়েছে, এখন সে জানতে চায় তার পরিমণ্ডল। যে পরিমণ্ডলের মধ্যে সে শিকড় মেলে দেবে—টবের গাছের আশা হয়েছে অভিনব।

বন্যার হাওয়া একটু থমকে ছিল, আবার তা পুব কোণ ঠেলে বইতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল কালো জ'লো-মেঘ। দিনের আলো পড়ল ঢাকা। দু'জনে সারা দিনটা কাটিয়ে দিল নায়ের ভিতর।

রাত্রির আঁধারে জল-বৃষ্টি মাথায় করে নৌকা খুলল রমজান।

'কই যান?'

'বাড়ি।'

তাড়াতাড়ি গলুই-র দিকে ছুটে আসতে চায় আমিনা।

'তুমি জলে ভিইজো না।'

'এ তো ইলশাগুড়ি।'

'তয় বইস। মানা করলে তো শোনবা না।'

প্রায় আধ প্রহর বাদে নৌকা এসে রমজানের গাঁয়ের কাছে থামে।

'কথা কইও না আমিনা, পুলিশ থাকতে পারে ওৎ পাইতা? তোমার পরনের শাড়িখানা বদলাও। যদি ধরা পড়ো, তোমার সাহেব সনাক্ত করে।'

'ভাল কইছেন, আমিনা তার বান্দী! বিবির শাড়িও তো অদল-বদল হইতে পারে। ভয় আপনার, আপনে হুঁশিয়ার হইয়া চলেন।'

এত বুদ্ধি আমিনার! রমজান বিস্মিত হয়ে থাকে। ইচ্ছা করে এই অন্ধকারেও মুখখানা একবার তুলে ধরে দেখতে।

হাওয়া আসে, মেঘ সরে যায়—মাঝে মাঝে তারা দেখা যায় আকাশে।

জল থৈ-থৈ করছে চারদিকে। খাল, মাঠ, গ্রাম একাকার। শুধু ব্যাঙ আর পোকা-মাকড়ের ডাক, মধ্যে মধ্যে গাছ-পালাকে আশ্রয় করে জ্বলছে জোনাকী।

আমিনা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে, 'এ সব কু-কাম করেন ক্যান মিঞা?'

অতি সাধারণ প্রশ্ন। কিন্তু জবাব দেয় না রমজান।

বাড়ির কাছে এসে রমজান কানখাড়া করে কি যেন শোনে। তার পর খানিকটা এগিয়ে যায়।

'যদি আমারে ধরতে আসে কেও, আমি কিন্তু পানিতে ডুব দিমু—যদি না উঠি ভাইবো না, তোমার ভয় কি, তুমি তো হইবা সাক্ষী।'

ধক করে উঠল আমিনার বুকটা। এত আগ্রহ করে বাড়ি এসে লাভ হল কি? কিন্তু তখন আর ফেরার উপায় নেই।

'এই তো আমার বাড়ি।'

'ঘর কই ?'

'পোড়াইয়া দেছে। ঐ দেখো না আধপোড়া ভিজাচাল ভাইঙা-চুইরা পইরা রইছে।'

'এমন ডাকাইত কেডা—ও মিঞা এমন ডাকু কে ?'

তোমার মনিব সুলেমান সাহেব, আমারও মনিব আমিনা। বড় জমিদার, সে কিন্তু এই গরিবেরে চেনে না।'

রমজান অতি সংক্ষেপে এখানে একটি গল্প বলে। গল্প নয়, সত্য ইতিহাস।

সুলেমান সাহেবের জমিদারী অনেকগুলো ডিহিতে বিভক্ত। তারই একটা ডিহির মধ্যে রমজানদের বাস। খাজনা ঠিক সময় আদায় না দিতে পারায় কারুরই নেই একখানি ফসলের জমি। দৈব-দুর্বিপাক কিম্বা অজন্মার দরুন খাজনা না দিতে পারা যদি অপরাধ হয়, তবে সে অপরাধের জন্য দায়ী যারা তারা ওদের পিতা-পিতামহ। কিন্তু ষোল আনী ভোগটা ভুগছে রমজানেরা। ভূমিহীন কৃষাণ, পেশার অভাবে হয়েছে ডাকু। চুরি-চামারী করে আর পেট ভরে না।

আমিনা চুপ করে শুনল—বুঝল সব ঠাণ্ডা মস্তকে। সে তার নসিব-ভরা দেখতে পেল অথৈ পানি। তার আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছা করল না ওখানে। 'মিঞা নাও খোলেন।'

'কোথায় যাবা ?'

'যেদিকে দুই চক্ষু যায়—কিন্তু এখানে আর না। কলিজা আমার জ্বইলা যায়।'

'পুলিশ, পুলিশ যে আছে ওতে-ওতে।'

'তাতে হইছে কি ? নাকের উপর এক হাত পানিও যা চৌদ্দ হাতও

তাই। আপনারে লইয়া ভাঁটি দিমু ঠাকুরঝি-তলার একেবারে শ্যাষ সীমায়— সমুদ্দুরের চরে।'

'কি আশায় ?'

অতি সাধারণ বাঁদী এক রহস্যময়ী নারীর মত হাসে।

'কি আশায় আমিনা ?'

এবারও রমজান অন্ধকারে শুধু হাসি শুনতে পায়। 'তুমি যে ক্যাবল হাসো ?'

'হাসি আপনার রকম-সকম দেইখা। পুরুষ মানুষ হাতে টাকা আছে, গায় হিম্মৎ আছে—নয়া চর বন্দেজ লইয়া ঘর বাঁধবেন, ধান রুইবেন, ভাবনা কি ?'

খুশি হয়ে রমজান জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি করবা ?'

'আমি ক্যাবল কান্দুম।'

'ক্যান আমিনা, এ কথা কও ক্যান ?'

'আমি তো বেহালা, আপনে তো ছরি, হামেসা ঘা দিলে আর কি করুম !'

'তোমাগো কি হামেসা আমরা জ্বালাই ? সারা দিনের হাড়ভাঙ্গা মেহনত পর একটু বাজাই—তা সইবা না ক্যান ?'

'মিঞা এটুক বোঝলেন না—ক্যাবল দুঃখেই কি মানুষ কান্দে ? অতি সুখেও আসে চৌক্ষে পানি।'

নৌকা সোঁতা খাল বেয়ে গাঙের মুখে আসতে আসতে ভোর হয়ে যায়। বাড়িতে দাঁড়াবার স্থান নেই, নায়ে থাকারও উপায় নেই—এখন ওরা আশ্রয় নেবে কোথায় ? যদি দিনটা গতকল্যের মতও মেঘলা থাকত ! বন্যাটাও হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। সূর্য উঠছে তার সবগুলো আলোর পেখম মেলে। নদী ঠাণ্ডা, কিন্তু ওদিকে যে এগুতে সাহস

হচ্ছে না। নিকটেই গঞ্জ—পুলিশ এসে নিশ্চয়ই হানা দিয়েছে আজ।

সারা দিনটা ওরা আত্মগোপন করে রইল সেই পূর্বের সোঁতা খালের মাথায়। ফল-মূল খেল যেমন সংগ্রহ করা যায়।

সন্ধ্যাবেলা আমিনা এক অদ্ভুত সজ্জায় সাজল। আলুলায়িত কুন্তল বাঁধল উঁচু খোপা করে। একখানা কম দামী ছাপার শাড়ি পরল নতুন ঢঙে ফেরতা দিয়ে? গায়ের জামা খুলে ফেলে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে নিল বুকে বেশ আঁটো-সাঁটো করে। দু'-একখানা ছোট হাতিয়ার ছাড়া বড়গুলো ফেলে দিল জলে। রমজানকে বলে নায়ের ছৈ কেটে করল অর্ধেক। এক গোছা রজনীগন্ধা যোগাড় করে খোঁপায় গুঁজে দিল একটু হেলিয়ে।

রমজান বলল, 'বাঃ চেনাই তো যায় না তোমারে।' তারপর—

আপনার ডর কি, আপনে তো সাথেই রইছেন। চুপ কইরা শুইয়া থাকেন পাটাতনের তলে।'

নৌকা যখন ছোট খাল ছাড়িয়ে বড় গাঙে এসে পড়ল, তখন এক হাতে কৃত্রিম লতা-বঁড়শির সূতো ছাড়ার ভান করতে লাগল আমিনা, অন্য হাতে তার বৈঠা।

সুমুখে গঞ্জ…বড় বড় কোষ নৌকা দেখে বোঝা গেল জেলার চুনো-পুঁটি অফিসাররাই কেবল আসেনি, বড় বড় ঢাউসগুলোও জড়ো হয়েছে।

একটি সামান্য বাঁদীর জন্য কত মাথা বাথা এবং কর্তব্য-জ্ঞান সুলেমান সাহেবের!

কিন্তু কি আশ্চর্য, সে বাঁদী এ সমস্ত গুণের মর্যাদা বুঝল না। চলল ফাঁকি দিয়ে একখানা গেঁয়ো গানের গমক তুলে। ঠাকুরঝির জল-স্থল উতরোল। সপ্তর্ষিমণ্ডল কাঁপছে যেন ঐ সুরে ঃ—

খসম খসম আমার আইলা না

কদু (লাউ) গাছে ধরছে যে কদু
ছান্নুন চাইখা গেলা না···
(খসম খসম আমার আইলা না)

একখানা চৌকিদারের নাও থেকে প্রশ্ন হয় কে যায় ?

আমিনা নাও থেকে জবাব দেয় জেলেনীদের ঢঙে, 'এক নাইয়া জাইলার ঝি—নাম আসমানী।' টর্চ জলে দু'তিনটা—সত্যই তো, খোপায় ফুল, হাতে বঁড়শি, নাও-এ বেদের মেয়েই বটে !

দু'দিনবাদে সমুদ্দুরের চরে যাদের দেখা যায় তারা রমজান ও আমিনা নয়— মহব্বৎ ও মেহেদী।

॥ সারেঙ্গির সুর ॥

'চামন, চামন !'

কেউ সাড়া দেয় না। বন্ধুর এক পার্বত্য বন পথ। একটি গিরিনদী উপলখণ্ড ভেঙে, ঠেলে, সবেগে নিচের দিকে ছুটে চলেছে। বেলা-শেষের নির্মেঘ নীলাকাশ। তার নিচে দিগন্তবিন্যস্ত ঘন নীল পর্বত শিখর যেন সাগরের স্তব্ধ ঢেউগুলো নীরবে দিনান্তের রোদে স্নান করছে। সেই শিখরেরই আঁকা-বাঁকা পথে পাগলী নদী উচ্ছ্বাসে ছুটে চলেছে।

যেখানে সামান্য একটু সমভূমির মত দেখা যাচ্ছে, সেখানে এসে ওর গতি হয়েছে মন্থর—যেন যৌবনের প্রান্তসীমান্তবর্তিনী এক তন্বী। রূপে চাঞ্চল্য নেই, কিন্তু স্তিমিত তীক্ষ্ণ দ্যুতির দিকেও চাওয়া যায় না।

মতিয়া এই অঞ্চলেরই পাহাড়ী মেয়ে। বনপথ ধরে ছুটে চলেছে চামনের খোঁজে। নদী তটে এসে মতিয়া থমকে দাঁড়ায়। সে এক অদ্ভুত ঝংকার শুনেছে। একি নদী তরঙ্গের জল কল্লোল উচ্ছ্বাসে উল্লাসে ভেঙ্গে পড়ছে.? খানিক্ সে কান খাড়া করে থাকে তার সঙ্গী চামনের কথা ভুলে।

না, না। এ যে এক অপূর্ব বাদ্য সংগীত। মাদলের মৃদুমৃদু বোল নয় তারের ঝংকার। ঐ তারের সঙ্গে যেন তার দেহের তন্ত্রী-গুলোর কি এক অব্যক্ত সম্বন্ধ।

মতিয়া ঝংকার অনুসরণ করে নদী পেরিয়ে চলে। কষ্টিপাথরের মত তার রঙে জেল্লা খেলতে থাকে অস্তগামী সূর্যরশ্মির।

মতিয়া বালিকা নয়, যুবতী নয়, চঞ্চলা এক কিশোরী। অত চাঞ্চল্য না থাকলে সে তার দৈহিক গঠনে ভ্রম জন্মাতে পারত যুবতী বলে।

অনেক দূরে ডেরা ফেলে এসেছে। এদিকে সন্ধ্যা হতেও বড় বেশি দেরী নেই। তবু মতিয়া নদীর ওপারে গিয়ে ওঠে। ঐতো ঝংকার শোনা যায় নিকটের ভাঙা দেবমন্দিরে। কে বাজায়, কেন বাজায়? এ যন্ত্র কি মতিয়া কখন দেখেছে? ঔৎসুক্য তার চরম হয়ে ওঠে। কিন্তু সন্ধ্যা নামে দুর্গম অরণ্য কন্দরে নানা শ্বাপদ ও কুসংস্কারের ভীতি নিয়ে। সে ভয়কে জয় করে এবার কিছুটা পথ অতিক্রম করে।

ঝংকার ক্রমে তীব্র হয়ে ওঠে।

মতিয়া স্থির হয়ে দাঁড়াতে চায়, কিন্তু ওর স্নায়ুকেন্দ্রগুলি যেন ছিঁড়ে যেতে চায় বাদ্যযন্ত্রের ঝন-ঝন ঝনৎকারে।

কখন চাঁদ ওঠে মতিয়া টের পায় না। কখন পার্বত্য বনভূমি শীতে কেঁপে ওঠে তাও মতিয়া বলতে পারে না। সে তার অজ্ঞাতে এক সময় মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়ে। এ মন্দিরে পূজোর নৈবেদ্য না নিয়ে কারুর প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ।

অনেক রাত্রে বাজনা বন্ধ হয়।

যে বাজনা বাজাচ্ছিল তার মুখে এসে খানিকটা জ্যোৎস্না পড়েছিল ভাঙা দেউলের ফাঁক দিয়ে। কিন্তু তাকে সুস্পষ্ট চেনা যাচ্ছে না। কত বয়স তাও বোঝা যাচ্ছে না সঠিক।

'সাধুবাবা!'

'হামি সাধু নইরে।'

'তবে তুমি কি ছে?'

'হামি, হামি এক বাজনাদার—জীবকা সেবক।'

'ইখানে জীব তো নেই ছে, বন-বাদাড়, গাছ-গাছালি আর পথার।'

বাস্তকর একটু হাসে মতিয়ার কথায়। 'তুই? তুই কি পাথর আছিস?'

সুরের সংঘাতে ভাঙা দেউল এখনও যেন রিমঝিম করছে। নদী বন ঝর্ণার ছন্দের ভিতর মতিয়া জন্মেছে। দেখেছে নৃত্যপরা ময়ূরীর পক্ষ বিস্তারণ। শুনেছে নভচারী কত বন-হংসীর অশান্ত কাকলি। সময় সময় তাকে স্তব্ধ করেছে বৌ-কথাকও পাখি, নয়ত হস্তিনীর বৃংহতি! কিন্তু কোথায়ও সে এমন মনমুগ্ধকর স্বর শুনতে পায়নি। এ যেন সুরের মধুধারা! গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে পদ্মমধু!

যৌবনের পরিপূর্ণ প্রকাশ যে কখনো অনুভব করেনি, সে যেন আজ বিরহ অনুভব করছে এক প্রেমিক পুরুষের। কিশোরীর ভিতর জন্মেছে প্রেমের ব্যাকুলতা। চঞ্চলতার সমাধি হয়েছে, দেখা যাচ্ছে প্রসন্ন গাম্ভীর্য।

মতিয়া মুখখানা একটু ঘুরাল। চাঁদের জ্যোৎস্না পড়ল আরও একটু ধারাল হয়ে।

'ও কি বেটি আঁখ মে পানি কেনে?'

চোখে কেন জল এল তা তো বুঝিয়ে বলতে পারে না মতিয়া। হাসি, ঠাট্টা, তামাসা ছাড়া যে কিছু জানে না সে আজ কাঁদল কি অব্যক্ত ব্যথায়? কিশোরী ভিল সে অনুক্ত সূত্রের সম্যক কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না। তাই সে আবার সলজ্জে নীরব হয়ে থাকে। চাঁদ ওঠে মহুয়া গাছ ছাড়িয়ে তাল গাছের চূড়ায়। অদূরে শোনা যায় পোকা মাকড়ের ঐক্যতান। এবার চাঁদ আটকা পড়ে শালগাছের ফাঁকে। তারপর দেখা যায় নিঃসীম নীলাকাশে যেন ভেসে চলেছে একখানা সোনার থালা। বর্ণে তার অপূর্ব লালিত্য।

এবার বাদ্যকর মনে মনে একটু হাসে। কি আশ্চর্য যে সব চেয়ে আনন্দ পেল, তার চোখেই জল! একি অদ্ভুত নিয়ম! এই কি তার সেবার ফল? না, না—সে আর মানুষের সেবা করবে না। শিবপূজা করে আর লাভ নেই। জীব মাত্রেই শিব। তাই সে শ্মশানচারী। শ্মশানবাসীর মনের চিতা সে কিছুতেই নির্বাণ করতে পারবে না। তার চেয়ে সে লতাগুল্ম অরণ্য বিটপীকে সংগীত শোনাবে। এতদিন ধরে তো সে তাই করে এসেছে। কোথা থেকে পিছু নিল এই পাহাড়ী বালা?

'তু ঘর যা বেটি, রাত বহুৎ হয়েছে, হামি আর বাজাব না।'

পরদিন আবার মতিয়া সন্ধ্যার একটু পূর্বেই আসে।

হামাকে বাজানা শিখাবি? বড় মিঠা তোর বাজানি।'

'না।'

'কেনে সাধু বাবা?'

ফের হামাকে সাধু বলছিস? হামি সাধু নইরে। হামার সাধ আছে, আশা আছে বেটি দিল্ ভরা।'

যে একাকী ভাঙা দেউলে মনুষ্য বিরল স্থানে বাস করে, তার আবার সাধ আহ্লাদ কি? মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা তো সংসারকে জড়িয়ে। সে সংসারই তো ও ত্যাগ করেছে, কিন্তু সন্ন্যাসী বললেও যেন ক্রুদ্ধ হচ্ছে। কিছু বুঝাতে না পেরে মতিয়া হাঁপিয়ে ওঠে। তবু সে বায়না ধরে বাজনা শিখবে বলে। ও জিজ্ঞাসা করে যন্ত্রটার নাম কি?

'সারেঙ্গি।'

কি সুন্দর নাম। উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে মতিয়া।

আচ্ছা একান্তই যদি বাজনা না-ই শেখাবে ওকে তো বাজিয়ে শোনাবে।

বাদ্যকরের মুখ বিকশিত হয়ে ওঠে।

সারেঙ্গির তারে ঘা দিতে দিতে বাদ্যকর বলে সে ঘর-সংসার বেঁধে গতানুগতিক পথে বাঁচতে চায় না। সে চায় শিষ্যা-প্রশিষ্যা পরম্পরায় বাঁচতে, সার্থক সুর-সেবিকার মাধ্যমে। কিন্তু তেমন একটিও তো অদ্যাবধি জুটল না। সে দেশ হতে দেশান্তরে, কান্তার হতে কান্তারান্তরে বৃথাই চাতকের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তেমনি একজন অনুরাগী শিষ্যাই তো মতিয়া হতে চাচ্ছে; কিন্তু কেন আপত্তি করে তাকে দূরে ঠেলে রাখতে চায় বাদ্যকর? মতিয়া কালো চোখের ঘন দিঠি দিয়ে উদ্‌ঘাটিত করতে চায় রহস্য। তার দুটি নয়নপ্রদীপ উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে।

বড় কঠিন শিষ্যাণী হওয়া। অতি দুরূহ ব্রত তাকে পালন করতে হবে। সে এক বিরাট কৃচ্ছ্রসাধনা।

এমন কি কঠিন ব্রত আছে যা সে করতে পারবে না? সে তো তার জাতীয় পালপার্বণে এই অল্প বয়সেই করেছে কত উপবাস—যা তার বয়সী মেয়ের পক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়।

সে এই বনের দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে একবার নাকি শাণিত বর্শা-ফলকের ওপর দিয়ে হেঁটেছে, ফুটিয়েছে হাতের তালুতে তীক্ষ্ণতম কণ্টক। এই তার চিহ্ন।

এসব শুনেও বাদ্যকর হাসে।

তবে সে এমন কি কঠোর সাধনা?

জংলিবালা তার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা রোধ করতে পারে না। চোখের চাহনি তার বহ্নিমান হয়ে ওঠে।

'হামি জীবন দেবে তোর পায়।'

তবু হবে না। মরেই যদি গেল, তবে কে পূর্ণ করবে বাদ্যকরের মনস্কামনা ?

তবে কি সে চায় জীবন্ত মানুষকে দগ্ধে দগ্ধে মারতে ? অশ্রু ঠেলে আসতে চায় মতিয়ার চোখে। মতিয়া নিজেকে সংযত করে বহু কষ্টে।

আশৈশব সে সুরের পাগল। সেই সুরের এমন অনবদ্য ঝংকারে প্রকাশ সে কি করে আয়ত্ত না করে থাকবে ?

চামন গেছে উঁচু পাহাড়ে মহুয়ার মদ সংগ্রহ করতে। চামন বাঁশী বাজায় চমৎকার ! সে ফিরে এলে তাকে চমৎকৃত করে দেবে ভেবেছিল মতিয়া। কিন্তু একি বিঘ্ন ?

'গন্ধর্ব কন্যার বাত শুনেছিস বেটি ?'

'না দেওতা।'

'বাজানি শিখতে হলে, গন্ধর্ব কন্যা বনতে হবে।' সে মেয়ে সুর-দেবতার কাছে উৎসর্গীকৃত হবে চিরদিনের মত।

খানিক বিস্ময়ে খানিক বিহ্বলতায় মতিয়া চোখজোড়া বিস্ফারিত করে। এ আর এমন একটা কি।

আমরণ তাকে ভুখা থাকতে হবে। সে কখনও পুরুষের সঙ্গ করতে পারবে না। সাদি সোংসার হবে না বেটি।'

এই কথা ! সাদি সংসারের জন্য মতিয়া মোটেই ব্যাকুল নয় ! তার চিত্তের প্রতিটি পাঁপড়ি আজ আকুল হয়েছে ঐ সুরের রশ্মির জন্য। কিশোরীর ভিতর এখনও বর্বর উদ্দামতা জাগেনি। দেহের চেয়েও আজ তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে কোন রহস্য আয়ত্তকরণ।

মতিয়া উদ্বিগ্ন করে তোলে বাদ্যকরকে। পতংগের মত সে পুড়ে যেতে চায় সুরের শিখায়।

'দে দে বাবা সারেঙ্গির বোল শিখিয়ে দে হামাকে।'

বাদ্যকর বিনা আড়ম্বরে নিয়মিত অনুষ্ঠানে মতিয়াকে গন্ধর্ব কন্যায় দীক্ষিত করে। তারপর সে নিত্য তাকে সারেঙ্গি শেখায়। বেহাগ, ললিত, ভীমপলশ্রী। মতিয়া আশাতিরিক্ত কৃতিত্ব দেখাতে থাকে। বাদ্যকর সন্তুষ্ট হয়ে তার ভাণ্ডার উজাড় করে দেয়। দিন কেটে যায় ঝংকারের মত উল্লাসে কেঁপে কেঁপে।

একদিন বাদ্যকর অদৃশ্য হয়।

চামনকে বিস্মিত করে দেওয়ার কথা মতিয়া ভুলে যায়। শিক্ষা তার সমাপ্ত হয়েছে। রাগ-রাগিণী মূর্ছনা এসেছে তার আয়ত্তে। সে সেই আনন্দেই বিভোর হয়ে বাজিয়ে চলে সারেঙ্গি। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতি তার পুষ্প পুলকিত বসন বদলায়, মতিয়ার হাতেও তেমনি সুর ও ঝংকারের অদল-বদল হয়—কখনও বেহাগের কারুণ্যে, কখনও মেঘ-মল্লারের অপূর্ব কম্পনে। বনস্থলী, পর্বতশিখর. গুহাবাসী সর্পিনী, নভচারী পাখীরাও যেন সময় সময় তন্ময় হয়ে থাকে। হয়ত শিকার ধরতে ভুলে যায় সিংহরাজ।

চামন মহুয়ার মদ নিয়ে ফেরে না। সর্পাঘাতে না শ্বাপদের আক্রমণে সে মরেছে, সে-খোঁজও মতিয়া নেয় না। গন্ধর্ব কন্যা নিজের সৃষ্টিতেই নিজে মশগুল।

চামন! চামন! একটি দিন যাকে না দেখলে, যার সঙ্গে ফুল নিয়ে, শিকার নিয়ে কাড়াকাড়ি না করলে মতিয়া অস্থির হয়ে যেত, সেই চামনের স্মৃতি কি করে যে মুছে ফেলে এ এক বিস্ময়।

বছর ঘোরে মতিয়ার বয়স বাড়ে, তবু চামনের কথা মনে পড়ে না। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত নানা সম্ভার নিয়ে ওকে ভুলাতে চায়, ওর স্নেহান্ধ নয়ন শুধু সারেঙ্গির দিকেই চেয়ে থাকে। ও সারেঙ্গির ভিতরই

দেখতে পায় ধরিত্রীর সর্ব রূপের উন্মেষণ। রূপ যেন বাঙ্‌ময় হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। ও তন্ময় হয়ে ছড়ি টেনে চলে তারের বুকে।

বর্ষার গেরুয়া জলের ঢলের মত ওর দেহে যৌবন আসে উদ্দাম আবেগে। চোখে নামে নিশিপদ্মের কোমলতা। সময় সময় ও অসম্বৃতবাসে সারেঙ্গি বাজায়। ওর রূপের কেউ পূজা করে না। বৃথাই যেন উপচে উপচে পড়ে যায়। দিবসান্তের কুসুম যেন কাঁদে, কোথায় ভ্রমরের ব্যগ্র চুম্বন ?

এবার ক্লান্ত মতিয়া সারেঙ্গি নামিয়ে রাখে।

'চামন কোথা ছেলো তুলসি ?'

তুলসি জবাব দেয় যে সে জানে না। কেন সেই যে চামন গেছে, আর তো ফেরেনি। মতিয়া কি একথা শোনেনি ! বছর গত হয়েছে পুরো চারটা।

'বলিস কি তুলসি ?'

'শের খেয়েছে তোর চামনকে। এখন দোসরা মরদ দেখ।'

'ভাগ ইখান থেকে।' মতিয়া ক্রোধে একটা ছড়ির আঘাত করে সপাং করে। তুলসি চলে যায়।

তবু চামন আসে না।

না-ই বা এল চামন। গন্ধর্ব কন্যার কাছে না-ই যদি আসে যে যোয়ান পুরুষ সে তো খুবই ভাল। কাছে এলে মতিয়া খুব জোর তাকে একটু আদর আপ্যায়ন করতে পারবে, তার বেশি সে আর কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু শের যদি খেয়ে থাকে চামনকে, তাই বা সহ্য করে কি করে মতিয়া? উঁচু পাহাড়ে যারা মহুয়ার মদ সংগ্রহ করতে যায়, অনেক সময় তাদের ভাগ্যে এ দুর্দৈব ঘটে। সে কি যে সে বিঘ্নসংকুল ঠাঁই !

শেরের কথা ভাবছে সবাই, বাঘিনীও গ্রাস করতে পারে। বনের নয়, মনের নয়, ভিন গাঁয়ের ভিন দেশের জীবন্ত মানব বাঘিনী। চামন তো সাদি করে কোথাও রয়ে যেতে পারে। কিছুই আশ্চর্য নয়। নইলে কি করে গত হল চার চারটা বছর ?

সারেঙ্গির সুর ঘন ঘন ছন্দ হারায় ছড়ির উত্থান-পতনে।

মতিয়া অতি কষ্টে হৃদয় সংযত করে। সে আবার দূরে ঠেলে ফেলে দেয় চামনকে। কোন দিন যে বিন্দুমাত্র পরিচয় ছিল, তাও মনের আয়না থেকে মুছে ফেলে দেয় মতিয়া।

গন্ধর্ব কন্যা ওর গুরুর কাছে নীরবে বারবার ক্ষমা ভিক্ষা করে।

মতিয়া কি যেন কি বাজাতে গিয়ে অবিমিশ্র বেহাগে চলে যায়। বৈকালের বনভূমি উদাসী হয়ে ওঠে। গেরুয়া অঞ্চল মুখে দিয়ে যেন সন্ধ্যাতারা সমবেদনায় কাঁদে। সপ্তর্ষিরা আর চাইতে পারে না যেন মতিয়ার দিকে। সারেঙ্গির মূর্ছনা দিকে দিকে হাহাকার করে ফেরে।

গ্রীষ্ম গত হয়। বর্ষা আসে নব নব মেঘমালার অর্ঘ নিয়ে। মল্লিকা, যূঁই, বেল ফুটে ওঠে স্তবকে স্তবকে। ময়ূরী নৃত্য করে ঝর্ণার কিনারে, দেয়ার দ্রিমি দ্রিমি তালের সঙ্গে দাদুরী ডাকে সঘনে।

মতিয়া মেঘমল্লার রাগিণীতে আলাপ করে। সারেঙ্গির কম্প্রমান তারের গমকে যেন আকাশের কালো মেঘ সজল হয়ে আসে। নামে মুষলধারে বর্ষা। ধরণী ঝাপসা হয়ে যায় মতিয়ার মনের সেই সকরুণ স্মৃতির মত। শুধু জল, শুধু জল—আশ্রয় নেই, অবলম্বন নেই, দিগন্ত-বিসারী শুধুই প্লাবন।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকায়।

কে যেন ডাকে. 'মতিয়া !'

'কে, কে—? চামন ?' সারেঙ্গির বোল সহসা স্তব্ধ হয়ে যায়।

অর্ধ পথে থেমে যায় মেঘমল্লার রাগিণী।

'হামি মহুয়ার মদ আনতে যাইনি। নকরি করে ঘুরলাম দেহাতে। তোর জন্যি কত চিজ এনেছি।'

'আর হামি তোর জন্য শিখেছি নয়া বাজানি।' রূপার হাঁসুলি পৈঁছি, কাঠের কাঁকই দেখে মতিয়া উচ্ছ্বাস থামাতে পারে না। 'এই দেখ ইটার নাম তুই জানিস, সারেঙ্গি।'

উজ্জ্বল উপঢৌকনগুলি নিজের হাতে চামন পরিয়ে দিতে যায় মতিয়াকে।

গন্ধর্ব কন্যা নিষেধ করে, 'না, না, ছুঁসনি তু হামাকে।' তার মনে পড়ে কঠোর ব্রতের কথা, মনে পড়ে অগ্নিসাক্ষী করে প্রতিজ্ঞার কথা। সে হৃদয়ের বল্‌গা টানে নির্মম হস্তে।

চামন চেয়ে থাকে মূর্খের মত।

অতঃপর একে একে সব বলে যায় মতিয়া। সারেঙ্গির ইতিকথা পর্যন্ত।

অন্ধ কুসংস্কারের ভীতি চামনকে পেয়ে বসে। সে বলে যে এ দেবতারই অভিশাপ। দেব মন্দিরে কেন প্রবেশ করেছিল মতিয়া পূজার নৈবেদ্য না নিয়ে?

মতিয়া মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

চামন চলে যায় উপঢৌকনগুলির দিকে দৃকপাত না করে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মতিয়া ওগুলো হাতে তুলে নেয়। কি করবে এখন? দেবে নাকি ছুড়ে ফেলে?

বিবেক তাকে নিষেধ করে। পুরুষের একান্ত সাহচর্যে দোষ হতে পারে, কিন্তু কি দোষ তার উপহার গ্রহণে? রূপোর হাঁসুলি তো আর জীবন্ত বাহুডোর হতে পারে না। নোলক পারে না তার কম্প্র ওষ্ঠে

এক অনাস্বাদিত অনুভূতি জাগাতে। মতিয়া অলংকারগুলো পরে সযত্নে। কাঁকই চালায় সুদীর্ঘ চিকুরে। তারপর উঁচু খোঁপায় পরে সদ্যফোটা ফুলের কলি।

প্রদোষালোকে সারেঙ্গির মূর্ছনা শোনা যায়। সে এক অবিস্মরণীয় বাদল সন্ধ্যা। বাঁশীতে অনুরাগের পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে আসে চামন। সংগত চলে সুরের মাধ্যমে, কিন্তু এ ও-কে কিছু মৌখিক বলতে পারে না।

এমনি করে শরৎ কাটে, হেমন্ত কাটে, কাটতে চায় না শীতের সুদীর্ঘ নিশা। পাহাড় অরণ্যের ব্যথার অশ্রু তুষারে দানা বাঁধে, তবু শীত যায় না। কাঁপে সারেঙ্গির সঙ্গে বিরহী বাঁশীর নব নব রাগ, নব নব ধ্বনি।

একদিন শীতও শেষ হয়ে আসে—গিরিনদী অর্গল খোলে। জীর্ণ অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে প্রকৃতি। দেখা যায় রক্ত পীত পুষ্পের হাস্যোজ্জ্বল ক্রীড়া, হরিণীর দেহ আঘ্রাণ করে আর্ত মৃগ। প্রজাপতির পাখায় সুগন্ধি ফুলরেণু।

কোকিল ডাকে, কিন্তু মতিয়ার চমক ভাঙার লক্ষণ দেখা যায় না। গন্ধর্ব কন্যা বুঝি বা সারেঙ্গির সুরের তলায় লাভ করেছে সমাধিশয্যা। সে স্পর্শ, গন্ধ, অনুভবের বাইরে বুঝি দেহাতীত হয়ে গেছে। প্রাণ নেই, শুধু যেন সুর।

আবার কোকিল ডাকে।

চমকিত বিস্মিত চামন সব ভুলে তাকে জড়িয়ে ধরে। তার সমস্ত সুদৃঢ় সত্তা দিয়ে অনুভব করে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস, পরমায়ু।

গন্ধর্ব কন্যা, দেবকন্যায় নয়, মানব কন্যায় রূপান্তরিত হয় পলকে। সে বলে, 'ঘর চল চামন। বাঁশী আর সারেঙ্গিটে তুলে নে।'

॥ ভেজাল ॥

তেলে জলে যেমন মিশ খায় না, তেমনি চাকরীটার সঙ্গে বনিবনা হল না রমেশের। আজন্ম কলকাতায় মানুষ—চাকরী একটা পেল কিনা পল্লী অঞ্চলে! ওষুধ নেই, যন্ত্রপাতি নেই, না আছে একটা যেমন-তেমন অপারেশন থিয়েটার—অথচ রমেশ হচ্ছে এখানকার সবচেয়ে বড় ডাক্তার। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার যেন।

বাজার অত্যন্ত খারাপ, চাকরী ছাড়া যায় না। অতএব মুখ গুঁজে পড়ে থাকে রমেশ। কিন্তু মেজাজটা সপ্তমে চড়ে থাকে তার সর্বদা।

একদিন সন্ধ্যার পর ঝড় জল নেমেছে। রমেশ একা। সঙ্গী কম্পাউণ্ডারটি গেছে নিকটের এক আত্মীয়-বাড়ি। হয়ত ঝড়ের জন্যই ফিরতে পারছে না। আর উপায়ান্তর না দেখে, কাপ দুয়েক চা খেল রমেশ নিজের হাতে তৈরি করে। তারপর একখানা কবিতার বই খুলে বসল গিয়ে বিছানায় উঠে। সবে সিগারেট একটা ধরিয়েছে, বাইরের থেকে ডাক এল, 'ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু'।

নিঃসন্দেহে আর্তকণ্ঠ, কিন্তু রমেশ অতি রুক্ষ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কে'?' আর জবাব এল না।

কিছুক্ষণ রমেশ কান খাড়া করে রেখে পড়তে লাগল,—

গগনে জমেছে ঘন মেঘভার কেমনে একেলা রই
আজিকার দিনে বাহিরে যেওনা বাহিরে যেওনা সই

বিপুল মেঘের কি যে সমারোহ দেখ আসি বাতায়নে
জাগে নাকি কোনও ব্যথা নবতর তরুণী তোমার মনে ?

রমেশ থামল। তার বড় অন্যায় হচ্ছে। বাইরে হয়ত অপেক্ষা করছে মুমূর্ষু রোগী, আর সে কিনা ডুবে রইতে চাচ্ছে প্রেমের কবিতায় ?

সে দরজা খুলে বেরিয়ে এল বারান্দায়।

শুধু ঝাপটা বাতাস। শুধু তালগাছগুলোর পাখার আর্তনাদ! শুধু অবিশ্রান্ত জল। জন-মানব নেই, কে ডাকল ?

হয়ত অনেকক্ষণ ধরে কেউ ডেকেছে, রমেশ মাত্র শেষবারই শুনতে পেয়েছে। এবং যে কণ্ঠে জবাব দিয়েছে, তা শুনে সে আর সাহস পায়নি এখানে দাঁড়াতে। রমেশ একজন পাশকরা ডাক্তার, তার উচিত হয়নি ও-ভাবে উত্তর দেওয়া।

রমেশ টর্চ বের করে এদিক ওদিক খোঁজে।

তবে কি মানুষ নয় ? কিন্তু অন্য কিছুর অস্তিত্বেও তো সে বিশ্বাস করে না। এবার সে কয়েকটা কর্দমাক্ত পদচিহ্ন দেখল বারান্দায়। অনেকটা ধুয়ে মুছে গেছে। নারীর কি পুরুষের বোঝা যাচ্ছে না সঠিক।

তবু তার মনটা ছম ছম করতে লাগল। সে ভিতরে এসে দরজা বন্ধ করল। তখনকার মত কবিতা আর জমল না।

অল্প সময় পরেই অপারেশন রুমে একটা কেমন যেন গোঙানি শুনতে পেল রমেশ। সে তাড়াতাড়ি আবার টর্চ নিয়ে বেরিয়ে এল।

একটি স্ত্রীলোক একটা কাঠের টেবিলের ওপর শোয়ান। তার মুখ চোখ নীল হয়ে গেছে। এত নীল যে দেখলে ভয় হয়।

সে নাকের উপর ঝুঁকে পড়ে বুঝতে পারল না যে স্ত্রীলোকটি বেঁচে

আছে, না মরে গেছে। হাতের নাড়ী দেখেও কিছু স্থির করা গেল না। আলো নেই, তাতে বর্ষার গাঢ় অন্ধকার। টর্চ জ্বালিয়েই বা কতক্ষণ কাজ করা যায়! একটা হ্যারিকেনের একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু রোগিণীকে কি এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া উচিত হবে? চারদিকে শেয়াল কুকুরের অভাব নেই। হয়ত খেয়ে ফেলল খানিকটা। ওকে সঙ্গে করে নিশ্চয় কেউ এসেছিল। সে গেল কোথায়? যদি তার ডাকে রমেশ তখন স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিত!

না অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে মানুষটার?

কিছুক্ষণের জন্য রমেশ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

কিন্তু নিজেকে সামলায় জোর করেই।

এ-ঘরে রোগিণীর মুখের সুমুখে টর্চের আলোটা তীব্রতম ক'রে দিয়ে, ও-ঘর থেকে একটা হ্যারিকেন নিয়ে আসে। বিদ্যুতালোকে মেয়েটির অদ্ভুত রূপ ফুটে ওঠে। এ রূপে নেশা লাগে না—কেমন যেন নেশা ছুটে যায়।

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নেওয়ার পূর্বে, রমেশ সামান্য পরীক্ষায়ই বোঝে, রমণী বিষ খেয়েছে।

কেন ও বিষ খেল?

কে সংগ্রহ করে দিল?

এ সংসারের সমস্ত বাসনা-কামনা কি ওর শেষ হয়েছে?

না, তা হয়নি। অন্তত ওর মুখে চোখে সে ছাপ নেই, বয়স সে-কথা বলছে না। কামনা-বাসনা তো কখনও মানুষের শেষ হয় না। যদি তা পূর্ণতা লাভের সুযোগ ঘটে থাকে, তবে সে তৃপ্তির ঔজ্জ্বল্য কোথায়? তবু ওর মুখখানা দেখলে মমতা জন্মে। কি যেন কি গভীরতা রয়েছে মর্মে।

রমেশ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে স্ত্রীলোকটির পাকস্থলী বিষমুক্ত করতে আরম্ভ করে।

একা একা বড় অসুবিধা হচ্ছে। রবারের পুরানো নল বিদ্রোহ করছে। এমন সময় যদি কম্পাউণ্ডারটা এসে পড়ত!

বাইরে বিশ্ব প্রকৃতি তখনও ভেঙেচুরে যাচ্ছে। আর কারুর সাহায্যের আশা নেই। একা রমেশকেই সব কিছু করে নিতে হবে। মেয়েটিকে বাঁচাতেই হবে।

কিন্তু কেন?

রমেশের হাত জিরোয় না। সংগে সংগে তার মনও বিশ্রাম পায় না। আজকার দুর্যোগের ঝাপটা বাতাসের মত চিন্তা আসে অফুরন্ত। যেন ঢেউরের পরে ঢেউ। শুধু উগ্র লবণাক্ত স্বাদ। বিকৃত বিধ্বস্ত করে দিতে চায় ওকে। রোগিণী গৌণ হয়ে যায়।

হ্যারিকেনের আলোটা উজ্জ্বল করে দিয়েও যেন রমেশ রোগিণীকে দেখতে পায় না। যে মুখ দেখে আর্দ্র হয়েছিল এই যুবক ডাক্তারের মন, সে মুখখানি কোথায় মিলিয়ে গেল?

আবার আলোটা বাড়িয়ে দেয় রমেশ। উজ্জ্বলতার শেষ সীমায় গিয়ে হঠাৎ লণ্ঠনটা বাইরের একটা ক্রূর ঝাপটায় নিবে যায়। এখন উপায়? রমেশ কিছুতেই এখন পাম্প ছেড়ে আলো জ্বালাতে পারে না।

সমস্ত গভীর অন্ধকার। এই প্রকোষ্ঠের বাইরেই ঝড়ের তাণ্ডব। রমেশ তো মানুষের চিকিৎসা করছে? না মড়া নিয়ে চালাচ্ছে পরীক্ষা?

রমেশ শক্ত করে রোগিণীর হাত চেপে ধরে।

যেমন সহসা লণ্ঠনটা নিবে গিয়েছিল, তেমনি সহসাই যেন এই অনুভূতিশীল নবীন চিকিৎসকের হাত পড়ে জনতার ধমনীতে। বায়ু উগ্র, কফ অসহ্য।

এ ব্যাধির হেতু কি?

ঠিক এ মুহূর্তে এর সূত্র আবিষ্কার করা চিকিৎসকের প্রধান দায়িত্ব নয়। স্ত্রীলোকটিকে বাঁচিয়ে তোলাই ওর প্রথম কাজ। রমেশ সজোরে হাতের পাম্প চালাতে থাকে।

কিন্তু কি মুশকিল, তবু ওকে ভারী লোহার মত তলিয়ে যেতে হয় গভীর তলদেশে। রোগিণী স্বেচ্ছায় যে বিষ খেয়েছে, তা না হয় তুলে ফেলা গেল। কিন্তু ওর অনিচ্ছায় যে বিষ অর্ধাহারে অনাহারে ওর দেহে আবার সঞ্চালিত ক'রে দেওয়া হবে, তার প্রতিকার কি? তথা-কথিত গণতন্ত্রী সমাজের রমেশ একজন বেতনভুক্ ভৃত্য মাত্র। সে জানে যে এ অপব্যবস্থায় এ কলঙ্ক কিছুতেই দূর করা যাবে না। তবু সে হাতের কাজে বিশ্রাম দিতে পারে না।

হয়ত মেয়েটি কারুকে ভালবেসেছিল। হয়ত তাকে পাবে না বলেই নিজেকে করেছে চরম আঘাত। প্রেমের একি সকরুণ ইতিহাস।

না, না—ও হচ্ছে এ অঞ্চলেরই চাষীর মেয়ে একটি। অন্তত ওর চেহারায় বেশবাসে সেই সিদ্ধান্তেই পৌছাতে হয়। এখানে প্রেম কোথায়, রোমাঞ্চ কোথায়? এখানে তো অন্তঃপ্রবাহী দুর্ভিক্ষই ঘোচে না।

ভোরবেলার দিকে ঝড় জল কমে আসে। রোগিণীও মৃত্যু রেখা উত্তীর্ণ হয়। কম্পাউণ্ডার সতীশ এসে পড়ে। রমেশ কতকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

'তুমি তো এদেশের লোক, দেখত ওকে চেন কিনা?'

'কেন চিনব না।'

'আগে মানুষটাকে দেখে নাও। না দেখেই তো জবাব দিলে!'

সতীশ লজ্জিত হয়।

'যাক তুমি ওযুধ দুটো আগে তৈরী করে নিও ; এক এক ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে হবে। আমি একটু হাত মুখ ধুয়ে আসি।'

রমেশ ভেবেছিল একটু বিশ্রাম করে, বেলা ন-টা নাগাত বের হবে। কিন্তু ততখানি দেরি করা ওর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয় না। ও শুধু মুখ ধোয়া নয়, চা-ও খায় তাড়াতাড়ি। ড্রেসটা বদলায় যতদূর পারে ক্ষিপ্র হাতে। ও এমন রোগী অনেক দেখেছে ছাত্রাবস্থায়। তখন যে দায়িত্ব বোধ করেনি তার চতুর্গুণ বোধ করে এখন। অথচ এ একটি অতি সাধারণ চাষীর মেয়ে—যার বাঁচা-মরা শাঁখের করাতের তুল্য। বরঞ্চ মরলেই বুঝি ছিল ভাল। এরপরও আছে সক্রিয় আইনের জ্বালা। সেখান থেকে বাঁচানো বোধ হয় রমেশের কর্ম নয়।

'ও কি খেতে চাইছে?'

'সতীশ বলে, 'না ডাক্তারবাবু।'

'খেতে চাইলে প্রথম নেবুর রস ছাড়া আর কিছু দিও না। ওর নামটা কি জিজ্ঞাসা করেছ?'

'না?'

'কেন বিষ খেয়েছিল, তা কি জেনেছ?'

'না।'

'এতক্ষণ ধরে করলে কি? পুলিস এলে তো বলতে হবে।'

'তারা জানবে কি করে?'

'ভাগাড়ে মড়া পড়ে থাকলে শকুনে জানে যেমন করে। যদি কিছু ফন্দি-ফিকির করে বাঁচানো যায়, সে পথ তো আগেই পরিষ্কার করে রাখতে হবে। সরো দেখি তুমি।'

সতীশ সরে যায়।

'তোমার নাম কি, তোমার নাম?'

'পার্বতী।'

'বাড়ি?'

'থানেশ্বরের···প্রিসিডিংয়ের বাড়ির গায়—লাগ্‌-উত্তরে।'

সেখানের প্রেসিডেন্ট তো নামকরা লোক। তার বাড়ির কাছে থেকে বিষ খেলে কেন তুমি?'

মেয়েলোকটি জবাব দেয় না। পূর্ব থেকেই মুখের ওপর ঘোমটা টানা ছিল, এখন তা আর একটু শক্ত হাতে সম্বৃত করে।

'কি, কেন বিষ খেয়েছিলে?'

পার্বতী আর কোন উত্তর না দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

'ও কি, তোমার হল কি? আমি তোমায় তো কিছু মন্দ বলিনি।' রমেশ অপ্রস্তুত হয়ে প্রবোধ দেয় পার্বতীকে। সারারাত ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে মুখখানার দিকে চেয়ে রয়েছে রমেশ চরম আগ্রহে, যার শ্বাসপ্রশ্বাসের পরিপূর্ণ স্পন্দন শোনার জন্য যে করেছে পরম যত্ন—সে এখন এমন কি আঘাত দিল স্ত্রীলোকটিকে?

'তুমি চুপ কর পার্বতী। না হয় যা বলার তা একটু সুস্থ হয়ে ব'লো। আর কেঁদ না, আমি চলে যাচ্ছি।

রমেশ নিষ্ক্রান্ত হয়।

দূর থেকে সে শুনতে পায়, ক্রন্দন ক্রমে যেন আর্তনাদে রূপান্তরিত হচ্ছে। এ কি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি!

নবাগত দু-একটি রোগীকে রমেশ সংক্ষেপে দেখে বিদায় দেয়। অন্য কোনও কাজে সে আর মন বসাতে পারে না। সে খানিক ইতস্তত ক'রে আবার পার্বতীর কাছে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়। কতকগুলি বাছা বাছা অন্তঃসারশূন্য মামুলী বুলি মনে মনে আবৃত্তি করে। তোমার ভয় কি? আমি তো রয়েছি, ইত্যাদি, ইত্যাদি···।

'পার্বতী !'

এবার মুখের ঘোমটা একটু সরিয়ে মেয়েলোকটি জবাব দেয়, 'বাবু !' আর সে কিছু বলার আগেই আবার তার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে।

'তুমি কোন চিন্তা ক'রো না। যতক্ষণ আমি জীবিত রয়েছি, তোমার কেউ কিছু করতে পারবে না।'

'বাবু, আমি আমার কথা ভাবছিনি, ভাবছি ছেলে দুটোর কথা। তারা তিন দিন ধরে কিছু খায় না। উপায় না দেখে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিনু। শুনতু সেখানেও নাকি ঠাঁই হবেনি। বড় জোর দু-চার দিন। সকলেরই এক অবস্থা।'

'তারপর কি করলে ?'

'আমার নাকের বেসরটা বেচে দুটো ট্যাকা জোগাড় করে'—

'তা দিয়ে বুঝি আফিং আনলে ?'

মেয়েটি চুপ করে থাকে।

'ভাল করনি। আত্মহত্যার চেষ্টা করাও মহাপাপ।'

'তা তো জানি বাবু, কিন্তুন—'

এই কিন্তুটার অর্থ কত ব্যাপ্ত, কত গভীর ডাক্তার রমেশ তা উপলব্ধি করেও সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে না, পারে না চাষীর মেয়েকে কোনও সক্রিয় সান্ত্বনার বাণী শোনাতে। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ধনতন্ত্রের অভিধান শেষ হয়ে যায়। কোনও ভাষ্য, কোনও বিশ্লেষণই খুঁজে পায় না সে।

অথচ বেলা বাড়ে নিয়মিত গতিতে।

পুলিস আসে। সংগে চৌকিদার ও দফাদার! ওরা নাকি ডাক্তারের কোনও সাড়া না পেয়ে পার্বতীকে এখানে রেখে থানায় গিয়েছিল।

'ডাক্তারবাবু, রোগীর অবস্থা কেমন ?' পুলিস অফিসারটি জিজ্ঞাসা করে। 'মারা গেলে এখানেই জ্বালা চুকে যেত। এখন বলুন তো কি করা যায় ?'

'একটা কিছু লিখে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে যান।'

'চাকরী করতে গেলে তা কি সম্ভব ?' চারদিকে যেমন জানাজানি হয়েছে, তেমনি থানায় নেওয়া হয়েছে ডাইরী। একটা গরুর গাড়ি ডাকো দফাদার। Sorry ডাক্তারবাবু, আমার হাত পা বাঁধা।

'যদি টাকা পয়সা দি।'

'এ ক্ষেত্রে তা হজম হবে না। থানেশ্বরের প্রেসিডেন্টের বাড়ির কাছের মরা। এক টুকরা জমি নিয়ে নাকি ওর সংগে তাঁর কি গোলমাল চলছে। ওর ভদ্রাসনের অংশ।'

পার্বতীর কান্না আবার আর্তনাদে পরিণত হয়। জমির জন্য নয়, জেলের জন্যও নয়—কি এক অব্যক্ত ব্যথায় হয়ত মাতৃহৃদয় আকুলি-ব্যাকুলি করে। সে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে।

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'ওকি, তোমার আবার হ'ল কি ?'

'বাবু আফিংয়েও ভেজাল—দু'-দু' ভরি খেয়েও কাজ হল না !'

পার্বতীর কথা শুনে উপস্থিত সকলেই চমকে ওঠে।

'দারগা বাবু, ওকে আপনি কিছুতেই নিতে পারবেন না। আমি লিখে দিচ্ছি, ও আদৌ আত্মহত্যার চেষ্টা করেনি। ওষুধ ভ্রমে বিষ খেয়েছিল।' রমেশ একটা খাতা টেনে, খস খস করে লিখে দিয়ে কপালের ঘাম মোছে।

॥ একটুখানি নুন ॥

ইলশেগুঁড়ি নয়—এই তিন দিন থেকে কেবলই বৃষ্টি ঝরছে। পথে-ঘাটে আর চলা যায় না। কাদা জলে একাকার।

পল্লী গ্রামের মুদী দোকান। কিন্তু এই আকালের বাজারেও পর্যাপ্ত পরিমাণ মালের আমদানী। তবে খাদ্যের চাইতে রকমারী মনোহারী জিনিষই যেন বেশী। প্লাষ্টিকের চুড়ি, খেলনা, ছোট বড় বেলুন ও মোমবাতি বর্ষার সন্ধ্যা। খরিদ্দার যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

কেবল একটী ডাগর চাষী-মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে একান্তে—কাদায়।

যখনি খদ্দেরের চাপ একটু হালকা হচ্ছে তখনই মেয়েটি বলছে, মহাজন পোখানেক নুন ধার দেবে?

বার তিনেক বাদে দোকানী জবাব দেয়, অ্যা কি বললি, বার্লি? তা তো দিলাম।

বাল্লি লয় গো, নুন পো-টাক।

তোদের মত ছোটলোকের কাছে মাল বিক্রি করা কি যে ঝকমারি! কেবল বদলাবদলি! দে, দে ফিরিয়ে দে বার্লির ঠোঙাটা। আবার একটু তুলে রখিস নি তো?

তোমার মত অত ছোট আত্মা লয়।

কি বললি কি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। এসেছে চাল বেচে মাল কিনতে, তার আবার এত ফড়ফড়ানি।

হবে না কেনে? মেয়েটি উত্তেজিত না হয়ে সংযত কিন্তু তীক্ষ্ন গলায়ই বলে, মাগনা তো নিচ্ছি নি। চালও যা, পয়সাও তা। বরং ডেড় পো চাল লিয়ে, তুমিই একপোর দামে মাল দিচ্ছ।

কি করে, কে বললে? যদি মেয়ে না হ'য়ে তুই বেটা ছেলে হতিস তো আজ রাখাল সেন তোর জিভ কেটে রাখত। জানিস আজ না হয় মুদি দোকান করছি, কিন্তু এককালে তোর বাপ-দাদা ছিল এই রাখাল সেনের চাকরান ভোগী। এক সংগে এতগুলো কথা বলে রাখাল সেন হাঁপাতে থাকে।

জানি গো তোমার নয়, তোমার বাপ দাদার। কিন্তুন সে দিন আর নেই সেন মশাই।

আলবৎ আছে। আমি নাকি ওজনে ঠকিয়েছি, বাটকারা আমার ছত্তি, শোনো শোনো ভাই ওর উক্তিটা।

মেয়েটি এগিয়ে আসে, একটু ব্যংগ মিশ্রিত স্বরে বলে, সত্যি বুঝি আর চাপতে পারলেনি, আপনা থেকে বেরিয়ে এল!

উপস্থিত খদ্দেররা হেসে ওঠে। কেন মিছি মিছি ঝগড়া করছ সেন মশাই। মালতী বড় কড়া মেয়ে ওকে আর ঘাটিও না।

রাখাল সেন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে চাল ফিরিয়ে দিয়ে বার্লির ঠোঙাটা ঘুরিয়ে আনতে যায়। নে তোর সম্পত্তি ফিরিয়ে নে।

মালতী রুখে না দাঁড়িয়ে বরঞ্চ পূর্বের মত উত্তাপ বর্জিত কণ্ঠেই বলে, কেনে? আমি বাল্লি ফেরৎ দিতে চাইনি তো—চাইছি এক পো নুন ধার

নুন নেই। তুই এখান থেকে ভাগ বলছি।

নেই বললেই হল—ঐ যে রয়েছে ডালা চাপা।

খদ্দেরের মধ্যে একজন বলে, নগদ পয়সা না হলে আজকাল কেউ নুন পায় না মালতী!

ও, আবার বুঝি বেলাক চলছে! মালতী একটু চিন্তা করে বলে, তা বাল্লিটা না হয় ধারে দিয়ে, নুনটা নগদ দাও। ও আমার চাই-ই চাই।

আমি তোর কাছে বেচব না, কিছুতেই নয়, মামা বাড়ির আবদার এখানে চলবে না। দূর হ আমার স্মুখ থেকে। রাখাল সেন ফেটে পড়ে।

সত্যি ?

হাঁ, হাঁ সত্যি।

এ দিনও তোমাদের থাকবেনি মহাজন! ভগমান দেখছে। তারপর মালতী সহস্র অভিশাপ দিতে দিতে বাড়ি ফেরে। তার সর্বাংগে যেন বিছুটির জ্বালা। কিছুতে যেন কমতে চায় না। সে চিন্তিত মনে কাদা ভেঙে হেঁটে আসে।

ঘন অন্ধকার। ব্যাঙের ডাক। পোকামাকড়ের একঘেয়ে ঘ্যান-ঘ্যানানি। কিছুই যেন কানে যাচ্ছে না মালতীর। এমন যে মরা তেঁতুল গাছটা, তার কাছে এসেও তার গা ছম ছম করছে না। সে যে কোথায় ডুবে গেছে। রাখাল সেনের সংগে বচসার দাহটাই যেন হয়েছে এখন প্রবল।

দোর গোড়ায় এসে মালতী হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। সে নিঃশব্দে পায়ের কাদা ধোয়। ঘর অন্ধকার। বালিটুকু রেখে একটা লম্ফ খুঁজে বার করে অতি সন্তর্পণে। কারুকে সে যেন তার উপস্থিতি জানাতে রাজী নয়।

বর্ষার মেঘলা আঁধারেই সে আবার বাইরে বেরিয়ে পড়ে। ছপ ছপ করে পাশের বাড়ি যায়।

মাসীমা লম্ফটা জ্বালিয়ে দেবে ?

ভোলানাথের স্ত্রী, গা-ভরা গয়না চমকে ওঠে।

ভয় পেলে নাকি ?

না, না—তোকে ভয় পাওয়ার কি আছে ? ভোলানাথের ঘরে তিনটা লম্ফ জ্বলছে। একটা ঠেকিয়ে মালতীরটা জ্বালিয়ে দেয় ভোলানাথের স্ত্রী

একটু নুন দিতে পার?

ভোলানাথের স্ত্রীর মুখ শুকিয়ে যায়।

ওকি? এই যে বললে ভয় পাওনি, তোমার যে মুখ এতটুকুন হয়ে গেল?

একেবারে বাড়ন্ত মা। এত বড় সোংসার, এবাজারে কি আর নুন বেশী আনতে পারি! ষাট, পাঁচ সের আনলেও আমার ফাঁপে না, কিন্তু তোমাদের এক পো আনলেও ভেসে যায়।

আশীর্ব্বাদ কর মাসী, বাবা সেরে উঠুক, তাই যেন হয় সত্যি হয়। আমাদের ঘরে বাড়বাড়ন্ত হক, তোমরা জ্বলে মরো।

মালতী দ্রুত চলে আসে।

এমন মুখরা মেয়েরও ঘরে ঢুকতে যেন বুক কাঁপছে।

অসুস্থ পিতা মধু চায় না, মিশ্রি চায় না—চায় একটু শুধু নুন। রুগ্ন-অরুচি মুখের এ এক অদ্ভুত আগ্রহ।

ছোট কচি ভাইটা পান্তা কিম্বা ফেনা ভাতে আপত্তি তোলে না। হট্টগোল জুড়ে দেয় নুন না দেখলে।

মালতী ধীরে ধীরে পা ফেলে।

অন্ধকার কুঁড়ে ঘরে আলো পড়ে ছেঁড়া কাঁথা পচা বেরা যেন দাঁত বার করে থাকে।

মালতী একটু এগিয়েই শংকায় থামে।

উমেশ উঠে বসেছে। জ্বর ছেড়েছে বুঝি। কিছু খেতে দে মা। এতক্ষণ কোথায় ছিলি? একটা লম্ফও জ্বলে না ঘোর সন্ধ্যেয়।

কি করে জ্বলবে' আমি যে বেড়াতে গিয়েছিনু।

আমি কি তা বলেছি? সন্ধ্যে বেলা সন্ধ্যে পিদ্দিম না দেখালে, সে ঘরে কি নক্ষীঠাকরুণ থাকে? দিন দিন তুই যে কি হচ্ছিস মা—কথায় কথায় ঝাল!

সব্বাই মিলে নংকা চটকাও কেন? জানই তো মাথার ঘায় কুকুর পাগল।

এই কথার কি এই জবাব, হায় ঈশ্বর! উমেশ চুপ করে থাকে!

মালতী দ্রুত রান্নার একচালার দিকে চলে যায়।

বার্লি জ্বাল দিতে দিতে ভাবে, এ এক নিষ্ঠুর পরীক্ষা। পিতার পেট কেন অস্থি মজ্জা পর্যন্ত পথ্য পথ্য করছে। কিন্তু আলুনি বার্লি দেখলে সে তো কিছুতেই স্পর্শ করবে না।

ভিজা জালতি। কিছুতেই আগুন ধরতে চায় না। ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে।

উমেশ হয়ত ক্ষুধার দাহটা কমাবার জন্যই অনিচ্ছায় কথা বলে। এই জলে কাদায় সন্তুটা গেল কোথায়? ও-টা কি খেয়েছে? বরঞ্চ আমায় না দিয়ে—

মালতী জবাব দেবে কি, সে ধোঁয়ায় অস্থির। নাকের জলে চোখের জলে একশা। সন্তুটা সেই সকালে দুটি ভাত মুখে দিয়েছে কি দেয়নি, নুনের জন্য উঠে গেল গনগন করে! মরুক সব, মালতীর আর সহ্য হয় না।

একবার দেখেছিল দুপুর বেলা পুকুর পারে খোলাম কুচি নিয়ে খেলতে। লক্ষ্মী ভাইটি শোন, শোন—এদিকে আয় দুটি খেয়ে যা।

অভিমানী বালক ছুটে পালিয়েছে। না, না, না—।

এত ভালবাসি, তুই তোর দিদির কথা শুনবি নি? ও সন্তু, লক্ষ্মী ধন আমার, ফিরে আয়। তুই না খেলে আমিও কিন্তু খাব নি।

না খেলি না খেলি, তুই আমার দিদি না হাতী!

মালতী হেসেছে, কিন্তু সত্যিই সে ভাত নিয়ে বসতে পারে নি। মা মরে, এমন বোঝাও তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছে!

বার্লি জ্বাল দেওয়া হলে মালতী লম্ফ ও বাটিটা পিতার সুমুখে এনে ঠিক্ করে রেখে অদৃশ্য হয়। উমেশ কোনো প্রশ্ন করতে আর অবকাশ পায় না। দিনের ভাতগুলো ঐ আঁচেই গরম করতে হবে মালতীকে। একবার নিবলে আবার উনান ধরান সহজ নয়।

রান্না ঘরে এসেও মালতী কান খাড়া রাখে শোবার ঘরের দিকে। এটা ওটা করতে তার কেমন যেন দেরী হয়ে যায়। একটু হক না— ভালই তো। ইতিমধ্যে তার পিতা নিশ্চয় খেয়ে ফেলবে পথ্যটুকু। তারপর না হয় খোঁজ নেওয়া যাবে অভুক্ত ভাইটার। এক সংগে দুজনকে সামলান অসম্ভব।

সবে হাঁড়িটা উনান থেকে মালতী নামিয়েছে, ঘরে শুনতে পায় উন্মত্ত তাণ্ডব। হাঁড়ি কলসী ভাঙবে না কি করবে যেন। বাবা আমার বুঝি ক্ষিধে পায় নি, তুমিই খাবে কেবল। দিদি, ওদিদি পেট যে জ্বলে গেল আমার। উঃ, মরে গেনু। কই লক্ষ্মীছাড়ি দিদি?

মালতী তাড়াতাড়ি এক থালা ভাত নিয়ে আসে। অমন করে না এই যে ভাত এনেছি ধন।

নুন?

মালতীর মাথা ঘুরে যায়—উমেশও বিরস মুখে বার্লিভরা বাটিটা সুমুখে নিয়ে বসে রয়েছে।

মনে মনে মালতী ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে। বালককে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, আজ যে তোমায় নুন খেতে কেনে দিই নি তাকি জান না— আজ নুন সাগরের পূজো, কারুক্কে নুন খেতে নেই।

তাই নাকি দিদি—সত্যি? বালক সরল বিশ্বাসে চারদিকে তাকায়। নুন সাগরের পূজো? বলিস কি! সহসা বালক সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, তবে যে বাবা খেলে নি?

কে বললে—খাও তো বাবা, খাও।

উমেশ আর অপেক্ষা করতে পারে না। সে বাধ্য হয়ে বার্লির বাটিটা মুখের কাছে তুলে ধরে।

দেখতে না দেখতে বৃদ্ধের চোখের ধারায় আলুনি বার্লি লোনা হয়ে ওঠে।

এতক্ষণ মালতী সময় পায়নি—এবার সে মুখ ফিরিয়ে অঞ্চলে চোখ মোছে।

বড় জ্বালা ভিজা কাঠের ধোঁয়ার !

॥ ফেরারী ॥

আকস্মিক হ'লেও অপ্রত্যাশিত নয়।

পাড়াগাঁয়ে ঘোপে-ঘাপে এমনি ঘটনাই ঘটে থাকে।

গোপী একবার মাত্র দেখেছিল উদ্যত ছুরিখানা। ছুরি নয়, বোধ হয় ছোট একখানা রামদা। এখন দুর্বল মস্তিকে ঠিক ভাবতে পারছে না। সে বৈঠাটা বাগিয়ে ঝটকা বাড়ি ছেড়ে ছিল ডাকাতটাকে লক্ষ্য ক'রে। তরুণী যাত্রীটির চিৎকার সে সইতে পারে নি। এখন সে বলতে পারে না তার প্রতিরোধ সফল হয়েছিল কিনা!

সে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এতক্ষণ নদীর কাদাচরে পড়ে ছিল। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ যেন শয়তানের মত উঁকিঝুঁকি মারছে। উন্মত্ত গর্জনে ফুঁসছে বর্ষার কালিগঙ্গা—মেঘে আকাশে যেন একই তুলি বুলানো, নির্জন পাড়ে পাড়ে যেন পাঠশালার দুষ্টু ছাত্রদের দোয়াত-ওলটানো কালি। জোয়ার আসার হয়তো বেশি দেরী নেই। এলে, নিশ্চয়ই তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। গোপীর আর রক্ষা নেই।

সে উঠতে চেষ্টা করে।

গোপী জীবনে কখনও খুন খারাপি করে নি, কোনও পেশাদার দলের সঙ্গেও সে সংশ্লিষ্ট নয়, তবু সে যদি ফের সন্দিগ্ধ হয়ে হাজতে যায়! প্রতিরোধ করতে গিয়েও আবার সাজে আসামী! সে পুলিসের কারসাজিতে এই তো ছ মাস খেটে এল হাজত। তার কলজে শুকিয়ে যায়। বিচারের নামে আবার প্রহসন! ঠিক প্রহসনও বলা চলে না। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি—খামখেয়ালীপনা।

হাকিম বললেন, গোপী, ওরফে গোপিকাবিলাস দাস—খালাস।

কিন্তু গোপীর যে সর্বনাশ হয়েছে এই কটা মাসে, তার খেসারৎ দেবে কে? ওর হাল গেছে, জোয়াল গেছে—তছনছ হয়ে ভেঙে গেছে নিম্নবিত্ত এক অতি সামান্য কৃষকের জীবন। আরও একটা বৃহৎ ক্ষতি হয়েছে, তা তো কারু কাছে বলা চলে না। ওর সাত বছরের মা-মরা ছেলে জীবন কি বেঁচে আছে? না, অভাব অভিযোগের বন্যায় ভেসে চ'লে গেছে একদিকে?

খালাস পেয়েও গোপীর ইচ্ছা করে না কাঠগড়া ছাড়তে।

হুজুর!

কিছু বলবে নাকি? তুমি নির্দোষ, খালাস পেয়েছ। কিছু বক্তব্য আছে নাকি তোমার?

না।

হুজুর সানন্দে রায় লিখে চলেন। আর নিরানন্দ গোপী সমস্ত এজলাসটাকে অবাক ক'রে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

একদা গোপী এক খেয়ালী বড় লোকের বাড়ি গিয়েছিল। ধনী ব্যক্তিটি শুধু খেয়ালী নন, শৌখিন বটেন। অজস্র পাখি পুষেছেন খাঁচায় খাঁচায়। কিচিরমিচির হুটোপুটির অন্ত নেই। বলতে হ'লে একেই ঠিক চিড়িয়াখানা বলা উচিত। কিছুক্ষণ দাঁড়ালে চোখ ও কান টাটিয়ে ওঠে।

কিন্তু ব্যতিক্রম একটি মাত্র কাকাতুয়া। সে স্থির হয়ে চোখ দুটো বুজে বসে আছে একটি কৃত্রিম ডালে। তার স্তব্ধ বিষণ্ণ মূর্তির দিকে বেশিক্ষণ চাওয়া যায় না।

হঠাৎ ধনী ব্যক্তি হুকুম পাঠালেন, মা কাশী যাচ্ছেন, পাখিগুলো সব মুক্ত করে দাও।

একে একে সমস্ত পাখি উড়ে যায়। কেবল চোখ মেলে না বুড়ো কাকাতুয়াটা।

কোন পাহাড়ে, কত দূরান্তরে ওর একটি নিজস্ব নীড় ছিল, ছিল শাবক ও স্ত্রী-বিহঙ্গিনী তা কেউ জানে না।

ওকে খুঁচিয়ে বার করতে চেষ্টা করে সবাই। সে এক দৃশ্য!

গোপী এসে এজলাসের বাইরে দাঁড়ায় জমাদারের হেঁচকা টানে।

সে এখন পর্যন্ত যেন মানে বুঝে উঠতে পারে নি এ নিষ্কৃতির।

পরদিন দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে গোপী দেখে যে, আগাছার বাগান হয়েছে উঠানটা। পায়রার খোপটা খালি। খড়ের গাদাটা নির্মূল করেছে দেশের যত গরু-বাছুরে মিলে। ঘরের ঝাঁপটা পর্যন্ত নিয়েছে চোরে।

গোপী কারুকে ডাকতে সাহস পায় না।

একটি ক্ষুধায়-কাতর ঘুমে নেতিয়ে-পড়া বালকের স্মৃতি ওর মর্মকোষে কেবলই দোলা দেয়। বাগানে, ঘরে, প্রাঙ্গণে যেন জীবন্ত ছায়া ঘুরে বেড়ায় ঘুরঘুর ক'রে। কত আবদার, কত গলা জড়িয়ে বায়না—সে কি ভোলা যায় কখনও! এক্ষুনি হয়ত গলা শুনলে ছুটে আসবে।

তবুও ডাকতে সাহস পায় না গোপী।

ভাবে, গাঁয়ের কারুর সঙ্গে এখন দেখা না হওয়াই মঙ্গল।

সে এসে মনসাতলার পাশে একটা নির্জন স্থানে বসে।

কি রে গোপী, খালাস পেলি কবে বাবা? একেবারে দেখি খুনীআসামীর মতই দেখাচ্ছে!

দাড়ি-গোঁফে সত্যই জঙ্গলাকীর্ণ হয়েছে মুখটা গোপীর। তা ব'লে তাকে খুনী-আসামীর মত দেখাবে কেন? যদিও বা দেখায় তার জন্য দায়ী কে?

বৃদ্ধ মহেশ্বর বলেন, দারোগাটা পরম পাজি। আমি তাকে ডেকে, নেমন্তন্ন ক'রে ঘি-ভাত খাইয়ে কত ক'রে বললাম। তবু শুনলে

না, একেবারে নেমকহারাম, নেমকহারাম বেটা! যাকগে ও-কথা। আমি তোর কাছে শুধু ঘাসের জমি দশ কাঠা ন্যায্য বগায় দিয়ে কিনতে চাই, স্রেফ নাটমন্দিরের সুমুখটা।

গোপী কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না।

তার বদলে আমি তোকে কি কি দিতে চাই শোন্—বীজধান, নতুন গরু কেনার টাকা, যদি ফের সংসারধম্মো করতে চাস—। বৃদ্ধ এগিয়ে এসে গলার স্বর আর একটু মোলায়েম ক'রে বলেন, তুই চিন্তা ক'রে দেখ্, ও-জমিটুকু নইলে নাটমন্দিরটা খোলতাই হয় না। একটা কেত্তন কি অষ্টপ্রহর হ'লে তোরাই তো নাচবি, কুঁদবি—আমাদের বাড়ির ছেলেরা তো সব সাহেব ব'নে গেছে।

গোপী দু হাঁটুর ভিতর থেকে মাথা তোলে না।

বৃদ্ধের পায়ে কাঁঠাল-কাঠের খড়ম, পরনে দুগ্ধশুভ্র খদ্দর। একজন এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়ায়। তাকে ইঙ্গিতে থামিতে বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করেন, তোর ছেলেটাকে কত ক'রে বুঝিয়ে বললাম, কেবল গরু দুটো নিয়ে একটু মাঠে যাবি, আর পেট ভ'রে ভাত খাবি, বাপকে তোর খালাস ক'রে আনলাম ব'লে। দুদিন একটু মাঠে গেল কি গেল না, কারুকে কিচ্ছু না ব'লে-ক'য়েই পিটটান। আর তার পাত্তাই পেলাম না আমি।

যে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল, সে মাথাটা নেড়ে অনুমোদন করে বৃদ্ধের বক্তব্য।

গোপী শুধু উঠে একদিকে চ'লে যায়।

যে ভাল ক'রে ধুতিখানা পর্যন্ত পরতে শেখে নি, সে একা একা গেল কোথায়? এ গাঁয়ে তো নিশ্চয়ই সে নেই। তবে কি শহরে

গেছে, গেছে তার পিতার খোঁজে? শহর পর্যন্ত সে কি পৌঁছুতে পেরেছে এত নদী খাল পেরিয়ে? একটু মেঘলা হ'লে যে ঘরের আশ্রয় ত্যাগ করে নি, রয়েছে গোপীর গাঁ ঘেঁষে, সে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে নিরালম্ব আকাশের তলে?

এমন কোনও আত্মীয় বন্ধু বান্ধব নেই, যেখানে গেলে গোপী ওর সন্ধান পাবে। তবু ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। জীবন নইলে এ বিশ্ব-সংসার আজ অন্ধকার। মণিহারা ফণীর মত গুমরে ওঠে গোপী।

সে একখানা নৌকা মাসিক ভাড়ায় সংগ্রহ করে। হাটে হাটে গঞ্জে গঞ্জে সে অনুসন্ধান ক'রে ফিরবে। কেরায়া বাইবে আর জিজ্ঞাসা করবে, তার জীবনধনকে কেউ কি কোথায়ও দেখেছে? এমনি নাক, এমনি চোখ—এমনি তার গড়ন। জগতে যত অপূর্ব ভঙ্গিমা আছে সব তার চলনে।

কেউ কি কিশোর-বয়সী কার্তিককে দেখেছ স্মিতমুখ তপঃক্লিষ্ট পিতার কাছে—কল্পনা করতে পার কি গৌরীহীনা সংসারে ওই শিশুই একমাত্র অবলম্বন?

কৃষক গোপী মাঝি হয়েছে—ওপারে যাবে এই আশা।

কিন্তু মেঘের ডম্বরু বেজে ওঠে। কালিগঙ্গার সে কি ফোঁসানি। নেচে নেচে মেঘকে ছোবল!

মাঝি, কেরায়া যাবে?

এমন সময় যাত্রী! একা নয়, আবার সঙ্গে একটি তরুণী। বর্ষণক্লান্ত মুখশ্রী।

কোথায় যাবে?

ওপারে, কার্তিকপুর।

সাহস তো কম নয় মশাইর। দেখছ না গাঙের চেহারা!

ডুবে মরলে আমি মরব—তুমি যেতে পারবে কি না তাই বল? কত ভাড়া চাও?

তুমি বাবু মরতে চাইলেই তো আমি আর টাকার লোভে উপলক্ষ্য হতে পারি নে। সঙ্গে আবার উনি রয়েছেন।

শ্রাবণের মেঘলা সন্ধ্যা। নির্জন নদীর পার।

স্ত্রীলোকটির গা-ভরা গয়না। পুরুষটির হাতেও দুটো আংটি। ঝড়ের চেয়েও অন্য একটা আশঙ্কায় গোপী মুহ্যমান হয়ে পড়ে।

এখনও পথ চেনা যায়, তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। ঠিকানা ব'লে যাও, ভোর-রাত্তিরে আমিই ডেকে আনব।

তাই চল গো, তাই চল। বাবার কথা শুনলে না, মার অনুরোধ রাখলে না—এখন মাঝির উপদেশ অমান্য ক'রো না। বুড়ো মানুষ, যা বলছে তা ভালই বলছে। পদে পদে বাধা, আমার আর এক পাও এগুতে ভরসা হয় না।

তোমার ইচ্ছে হয় তুমি একা ফিরে যাও—আমি আমি আর চণ্ডালের বাড়ি জলস্পর্শ করব না।

ছিঃ ছিঃ, কি যে তুমি বলছ!—স্ত্রীলোকটি লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকে।

কালো মেঘ আরও কালো হয়ে আসে যে কোনও মুহূর্তে জল নামলেই নামতে পারে। ও-পারের আর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মাঝে মাঝে ঝিলমিল ক'রে ওঠে এক ফালি বিদ্যুতের ছুরি।

এখনও সময় আছে, আর দেরি ক'রো না গো। আমি পথ চিনি, তোমায় নিয়ে যেতে পারব কলমী-দীঘি বাঁয়ে ফেলে।

স্বামী রেগে উঠে। বলে, তুমি আমাকে ঠিক চেনো নি এখনও।

দেখছি মশাইর ধনুক-ভাঙা পণ। কিন্তু—

কিন্তু নয় মাঝি, বড্ড অপমান হয়েছি। তুমি কেরায়া যাবে কি না বল? কত টাকা চাও?

এবার স্ত্রীলোকটি মুখ খোলে। বলে, আমি আর না ব'লে পারলাম না—এত যার টাকার গরম সে আবার বরপণের বাকি কটা টাকার জন্যে এমনও যা-তা কাণ্ড করে! ছি-ছি, তুমি না অবস্থাপন্ন ভাল চাকুরে!

গোপী বলে, ভীষ্ম হ'লেও কথা ছিল। রাজা দুর্যোধনও নও বটে; তবে আর শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে দোষ কি! উনি এত ক'রে বলছেন। আর আমি তো এখন কিছুতেই নাও খুলব না।—সে নৌকাটা একটা ছোট খালে এনে ভেড়ায়।

বর্ষা নামে।

একটা কিছু অশুভ দেখেই এমন হয়। আমার বিয়ে দিয়ে বাবা সর্বস্বান্ত হয়েছেন, তবু তোমার মন উঠল না। চল চল, আমিও আর বাড়ি ফিরব না। ঈশ্বর, এই যাত্রাই যেন আমার শেষ যাত্রা হয়।

তরুণী গিয়ে নায়ে ওঠে। গোপী আর কিছু বলতে পারে না।

দূরে নদীগর্ভে শত সহস্র নাগ-নাগিনীর তর্জনগর্জন শোনা যায়।

ওরা অনেকক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকে। গোপী নৌকার দু মাথার দুখানা ঝাঁপ ভাল ক'রে টেনে দিয়েছে। অনেকটা খোপের মত হয়েছে এখন। বর্ষা এবং নদীর ফোঁসানি চলছে সবিক্রমে।

ক্লান্ত উপবাসী গোপীর ঘুম পায়। সে আর ব'সে থাকতে পারছে না যেন। চোখ বুজে আসছে বারবার। কিন্তু পা মেলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। একে এক-বৈঠার ডিঙি, তাতে অবাঞ্ছিত যাত্রী। প্রথম কেরায়াটা গোপীর জুটেছে ভাল।

উজ্জ্বল লম্ফটাও গোপীর মত ঝিমিয়ে আসে। অস্বস্তি, তিক্ততা, ক্ষোভে যেন ছৈয়ের ভিতর সময় স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। বাইরে কিন্তু তারই গতি যেন উল্কার মত। শব্দে তার বুক শুকিয়ে আসে।

মাঝরাত্রে হঠাৎ নৌকাটা টলমল ক'রে ওঠে। অনেকগুলো মানুষের চাপা আওয়াজ! গোপীকে বেঁধে ফেলে একটা গামছা দিয়ে। মাথায় মারে সজোরে একটা আঘাত। তারপর জলে একটা শব্দ।...

উঃ, খুন করলে গো—খুন—

চুপ, চুপ।

থাম্, থাম্।

কে, কে? কে বাবা তোমরা?

পুরুষ যাত্রীটির গলা আর শোনা যায় না।

গোপী এর ভিতরেই একবার রুখে উঠেছিল, কিন্তু তার সহজাত সেই তীব্র মানবতাবোধ সফল হয়েছে কিনা, তা সে জানে না।

কাদাচরে গোপী উঠে বসে।

খুন হোক কি না-হোক ডাকাতি তো হয়েছে একটা। সে হাজত-খালাস সন্দিগ্ধ আসামী। তার নৌকায়ই এই ঘটনা। এবার তার আর নিস্তার নেই। পুলিস আসল আসামীর সন্ধান পাবে না, হয়তো টাকা পেয়ে সেদিকে ধাওয়াই করবে না। সমস্ত দোষটাই চাপিয়ে দেবে গোপীর মাথায়। তারপর যদি সাক্ষী-প্রমাণে সুবিধা না হয় জজ সাহেব আবার বলবেন, গোপী, ওরফে গোপিকাবিলাস দাস—খালাস...

হাসতে ইচ্ছা করে গোপীর। কিন্তু তার হাসার সময় নয় এখন। তাকে আত্মরক্ষা করিতে হ'লে অবশ্যই আত্মগোপন করতে হবে। সে

ধীরে ধীরে গামছার বাঁধন খুলে উঠে দাঁড়ায়। শক্তি নেই তবু সমস্ত শক্তি সংহত করতে চেষ্টা করে।

সে একটা কাদা-মাখা পশুর মত থপথপ ক'রে চলে।

সন্তান এখন তার কাছে প্রধান নয়, প্রধান হয়েছে নিজের জীবন। কি ক'রে সে বাঁচবে? এড়িয়ে চলবে মানুষের দৃষ্টি?

এখন অন্ধকারে যেটুকু চাঁদের আলো, তাও যেন ভাল লাগে না। যে জল এই কিছুক্ষণ হয় বন্ধ হয়েছে তাও যেন পড়লেই সে থাকত আশ্বস্ত।

গোপীর মাথাটা টনটন করছে। সে ভিজে গামছা দিয়ে আহত স্থানটা শক্ত ক'রে জড়ায়। কত দূরে কি ভাবে গোপী ভেসে এসেছে, না সাঁতার কেটে এসেছে সে স্থির করতে পারে না। হাত ছিল বাঁধা, সাঁতার কাটা তো অসম্ভব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওইটাই সম্ভব হয়েছে। ছেলেবেলা সে শিখেছিল ভাল সাঁতার।

নৌকাখানার জন্য চিন্তা হয় গোপীর। দামী নৌকা। তাকে বিনা জামিনে দিয়েছে স্রেফ বিশ্বাস ক'রে ভাড়া। একখানা শালকাঠের নৌকা তাকে তো বেচলেও হবে না।

সে একবার অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখে।

চকিতে মনে পড়ে বৌটির মুখ। পলকে বিগলিত হয়ে ওঠে অন্তর।

উন্মত্ত তুফান ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না গোপীর।

সে কূলের দিকে এগিয়ে চলে। কিছুদূর এগিয়ে ফিরে আসে। তার পায়ের দাগগুলো হয়ত সকালবেলা চেনা যাবে। হয়তো সনাক্ত হয়ে যাবে গোপী। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে, এখন কি করা তার কর্তব্য?

পুলিসে যে কত রকমে আসামীকে অনুসন্ধান ক'রে বার করে, হাজতে ব'সে গোপী কিছু কিছু তা শুনেছে। সে অস্থির হয়ে পড়ে।

আবার জলে নামে গোপী। সাঁতার কেটে একটা হোগলাবনের কাছে যায় এবং তার ভিতর দিয়ে পথ ক'রে তবে ওপরে ওঠে।

এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত। তবু সে একটা জংলা ঝাড়ের আড়াল থেকে ছুটে আর একটার আশ্রয় নেয়। এমনি ক'রে এখন এগুতে হবে।

কিন্তু কত দূরে? কোথায়?

ভোর তো হয়ে এল। পূর্বদিকের আলোর আভাস—অভিশাপ, অভিশাপ গোপীর কাছে। অথচ এখন এ জগতের কে না চাইছে আলো?

দোয়েল শিস দিচ্ছে। মোরগ ডাকছে গৃহস্থ-বাড়ি। আজান মসজিদে, ভজন মন্দিরে। কৃষককে ডেকে তুলছে কৃষাণী।

এই যে!...

কে যে? গোপীর হৃৎপিণ্ডটা ছলাৎ ক'রে ওঠে। চট্ ক'রে সে লুকিয়ে পড়ে একটা বড় গাছের আড়ালে। সত্যযুগের মত সে যদি একেবারে ভিতরে ঢুকে যেতে পারত! তবু সে যতদূর সম্ভব সংকুচিত ক'রে থাকে নিজের অতবড় দেহটা। মাথাটা রাখে একটা ডালের পাতার ভিতর গোপন ক'রে। ভয়ার্ত শশকের কথা মনে পড়ে গোপীকে দেখলে।

এই যে, দেশলাইটা নাও।

তখন খালের জল ফুলে উঠেছে। ছলছলানি কলকলানি শোনা যাচ্ছে জোয়ারের। এক্ষুনি কূল-পার একাকার ক'রে দেবে।

দেশলাইটা ভিজে। পারলে তাওয়াটা দাও। গুলটা ধরিয়ে নেব।

দুখানা ছোট ডোঙা এসে পাশাপাশি ভেড়ে। একখানা যাবে হাটে—কলা-কচু বোঝাই। অপরখানায় ছোট্ট একখানা হেউলী-পাতার সাময়িক ছৈ, ভিতরে একটি কৃষকের মেয়ে যাত্রী।

দু নৌকায় কথা হচ্ছে।

গোপী ঘামিয়ে ওঠার যোগাড়—কেন, কেন, এপার ঘেঁষে এগিয়ে আসছে কেন? নিশ্চয়ই ওরা লক্ষ্য করেছে গোপীকে।

তখনও খালের পারে ঝোপে জংগলে অন্ধকার জড়িয়ে রয়েছে। গোপী হুড়মুড় ক'রে জলে নেমে একটা বাঁকা গাছের তলায় আশ্রয় নেয়। গাছটা কূল থেকে খালের দিকে প্রসারিত।

কোথায় যাচ্ছ কেশব? নায়ে কে? দেশলাই জ্বালতে চেষ্টা করলাম; অনেকক্ষণ তামাক খাই নি। কটা মাত্তর কাঠি, তাও ভিজে।

আগুন বুঝি জ্বলল না?

না হে, না। নারিকেলের ছোলাটা উড়িয়ে নিয়ে গেল দমকা বাতাসে।

দাদুকে যে উড়িয়ে নিয়ে যায় নি, এই ভাগ্যি!

কে রে, লক্ষ্মী নাকি? চলেচিস বুঝি বোলতলী খামারে? এবার কেমন হয়েছে আউশ?

পৌষের মত ফলন। কিন্তু ভাত পায় না চাষী। দাদু গো, ঘরে ঘরে কান্না, চোখের জল রাখা দায়।

কেন রে?

মুনিবে সরকারে পুলিসে লুঠছিল। খেটে-খুটে দিয়ে থুয়ে কিচ্ছু থাকে না ঘরে। দুদিন যেতে না যেতে যে-ই পাগল সে-ই ঠিক। উজাড় হ'ল গাঁয়ের চাষী।

কিছু সময়ের জন্য তামাক খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। নাও কিন্তু ঠিকই ভেসে চলে। বৈঠা বাইছে না কেউ, তবু গতি অব্যাহত।

এদিক ঘেঁসে আসছে কেন? সর্বনাশ! বুঝি দেখে ফেলেছে গোপীকে! গোপী নিশ্বাস বন্ধ ক'রে থাকে।

ডোঙা দুটো সেই গাছটার কাছে এসেই থামে।

বুড়ো দাদু বলে, প্রথম ঠাহর পাই নি—

গোপী ভাবে, তবে কি এইমাত্র পেল? সে তো নড়ে নি একটুও। শঙ্কায় তার সর্বশরীর ঝিমিয়ে আসে। জোয়ারের জল বাড়ছে ক্রমে ক্রমে।

শেষে চিনলাম কাছে এসে।

কাকে চিনল? গোপীকে নয়তো? সে তীব্র উৎকণ্ঠায় সময় কাটায়। এবার জল ঢুকতে থাকে নাকে মুখে। এ রকম কতক্ষণ আর থাকা যাবে এখানে? প্রতি মুহূর্ত যুগ ব'লে মনে হয়।

শেষ পর্যন্ত ওরা তামাক খায়। আর দু-একটা কথাবার্তা বলে। কিন্তু এত ধান হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রসংগই যেন জমে না। গৃহস্থের মুখের হাসি শুকিয়ে গেছে। স্বাভাবিক রসিকতা নেই দাদুর নাতনীর মধুর সম্পর্কে।

ওটা কি? লক্ষ্মী প্রশ্ন করে, ওইটা—

কোন্‌টা? আবার গোপী কেঁপে ওঠে। এদিকে তো শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

ওটা কুমীর নয়, একটা কলাগাছ। ভয় নেই। নাও খুললাম লক্ষ্মী। আবার দেখা হবে কেশব।

লক্ষ্মী দূর থেকে প্রণাম জানায়। বলে, দেখা হবে যদি প্রাণে বাঁচি।

গোপী হাঁফ ছেড়ে ওপরে ওঠে। মুমূর্ষুর মত নিজেকে প্রায় মাইল খানেক টেনে নিয়ে এসে একটা জঙ্গলের ভিতর অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

আবার যখন জ্ঞান হয় গোপীর তখন বেলা হয়েছে অনেকটা। কিন্তু সঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না লতাগুল্ম-জড়ানো উঁচু গাছের ফাঁকে। একটা শান্ত স্নিগ্ধ শ্রী রয়েছে সর্বত্র।

গোপী নিজের পরিবেশটা উপলব্ধি করে ধীরে ধীরে। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে নিশ্চিন্ত মনে। তার স্নায়ুকেন্দ্রগুলি যেন খেটে খেটে শিথিল হয়ে পড়েছে। বিশ্রাম—একান্ত বিশ্রামের প্রয়োজন।

কি অদৃষ্ট! পাশবিক ক্ষুধায় তাকে নিষ্ঠুর রাখালের মত তাড়না করে। সে উঠে বসতে বাধ্য হয়। এখানে মানুষের খাদ্য কোথায়? শুধু গাছপালা আর জংগল।

যে স্থানটায় সে এখন রয়েছে, তা কি সম্পূর্ণ নিরাপদ? নিকটে গ্রাম। ওই তো মানুষের উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়, রাখাল বালকদের চিৎকার। গোপী আরও নিবিড়, নির্জন স্থানের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। নিকটে একটা বেতের ঝাড়। ওপরটা অত্যন্ত ঝাঁকড়া, নীচটা সেই তুলনায় খুবই পরিষ্কার। গোপী কচ্ছপের মত এগিয়ে গিয়ে ভিতরে ঢোকে।

এখন আর তার কোনও আশঙ্কা নেই। কিন্তু কেউ তাড়া দিলে পড়বে মহা জ্বালায়। বঁড়শির মত টেনে ধরবে বেতের ধারালো কাঁটাগুলো।

ক্ষুধার তীব্রতা তো কমে না। মানুষের জীবনের চরম অভিশাপ ক্ষুধা। কিন্তু সমস্ত সংসার আজ অসাড় হয়ে যেত যদি তাড়া না থাকত ও-টার। বিচিত্র, বিচিত্র এ লীলা!

গোপী হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে থাকে। মমতায় দ্রবীভূত হয়ে আসে অন্তর। ক্ষুধাক্লিষ্ট তনু পলকে পুলকিত হয়ে ওঠে। রাখালদের কলরবের ভিতর একটি ভিন্ন স্বর, ভিন্ন ঝঙ্কার সে যেন শুনতে পেয়েছে।

তার তো বার হওয়ার উপায় নেই। সে কান খাড়া ক'রে রাখে। এ যেন বহুশ্রুত, অতি পরিচিত কণ্ঠ। প্রতিটি উচ্চারণের লালিত্য তাকে মুগ্ধ করে।

অনেকক্ষণ বাদে গোপী বোঝে, এ তার ভুল।

আবার আহার্যের জন্য গোপীর পাকস্থলী অধীর হয়ে পড়ে। এ কি বিড়ম্বনা! সব চেয়ে ভাল হ'ত, যদি গোপীর এ ভুল আর না ভাঙত!

বেলা যত বাড়ে ওর অনুভূতি তত শাণিত হয়ে ওঠে। এখন গোপী খানিকটা কাঁচা মাংস পেলেও বোধ হয় খেয়ে ফেলে দিতে পারে। পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত সে ছটফট ক'রে সময় কাটায়।

নিকটে একটা হেলানো নারকেলগাছ। ডাব থাক্," ঝুন থাক্— ওটার মাথায় সে উঠবে। কিছু সে মানবে না। এ সঙ্কটে মানুষ কিছু গ্রাহ্য করতে পারে না। কিন্তু নারকেলগাছটা যে শীর্ষহীন। হয়তো বাজ পড়েছিল এককালে।

গোপী শূকরের মত কতকগুলো কচি খেজুর-মাথি টেনে তোলে। চিবিয়ে খেয়ে তবে সুস্থ হয়।

বেলা ঢ'লে পড়ে পশ্চিমে।

গোপীর লোভ হয় রাখাল ছেলে কটিকে দেখার জন্য। তার মনের এ দুর্বলতা যে নিতান্তই ভিত্তিহীন, সে তা ভাল ক'রেই বোঝে। তবু স্নেহের আকর্ষণ অন্ধের মত তাকে টানে। সে উঁকি-ঝুকি মারতে থাকে।

কয়েকটা গাছ, কতকগুলো মাত্র লতার ব্যবধান। তার পরই হয়তো দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সব চেয়ে কাম্য জন। খেলছে এখন, কলরব করছে সংগীতের সংগে। কিন্তু সন্ধ্যা এলেই ব্যাকুল হয়ে পড়বে একটু নিরাপদ উত্তপ্ত আশ্রয়ের জন্য।

গোপীর মনটা টাটিয়ে ওঠে। এ টনটনানিকেও হার মানায় আকস্মিক বন্দুকের শব্দ। ধর্, ধর্, শালাকে ধর্।

কোথায় দেখছি নে তো?

সিপাহী একজন বলে, তুই ব্যাটা নাকি নাম-করা চৌকিদার? তোর

উর্দি খুলে নেব কাল দারোগাবাবুকে ব'লে। একটা ঠ্যাং-ভাঙা বুনো মুরগী ধরতে পারে না, এসেছে ডাকাত পাকড়াও করতে!

ঝোপের ওপর লাঠি পড়ে সশব্দে।

এর মধ্যেই দারোগা এসেছে! গোপী পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করে। হয়তো এক্ষুণি একটা পাকা বাঁশের লাঠি তার মাথায় এসে পড়ল আর কি!

কি রে, খোঁজ পেলি?

চৌকিদারটা ভয়ে ভয়ে বলে—এই তো দেখলাম—শালা আবার গা-ঢাকা দিলে কোথা?

ভাল ক'রে দেখ, একটু ভিতরে ঢোক্—ভয়ে একেবারে জবুথবু!

যে কাঁটা, পা পাতা যায় না। উঃ!

গোপী জড়িয়ে পড়ে সুতীক্ষ্ণ কণ্টকে। ঘেমে ওঠে তার সর্ব শরীর।

এমন হ'লে চাকরি রাখবি কি ক'রে! চাষার আবার কাঁটার ভয়! ব্যাটা যেন নবাব ব'নে গেছে। ওই—ওই—ধর্ দৌড়ে। আবার স্লট ক'রে না পালায়।

এবার ছুটে গিয়ে একটা আহত বুনো মুরগীকে টেনে আনে চৌকিদার।—তোমাকে না পেলে বাবু যে আজ কি বুকুনিটাই ছাড়তেন। দুদিন ধ'রে নাকি ভাল খাওয়া হচ্ছে না তাঁর, এখন না ঝিমিয়ে ঘরে গিয়ে ঘুমিও। চল লক্ষ্মীটি, ছ-কোষী জজের নায়ে চল।

সন্ধ্যার পর গোপী বেরিয়ে আসে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে। নিকটের একটা তালগাছে উঠে তৃষ্ণা নিবারণ করে। টাটকা তালের রস।

চোখে তার ঘুম আসে গাঢ়।

ঝিঁঝির ডাকের সংগে সারা রাত ছন্দ মিলিয়ে চোখ মিটমিট করে

অসংখ্য তারা। অনভ্যস্ত ক্লান্ত গোপীর মগজে ক্রিয়া হয় অসাধারণ। সে সমস্ত রাত পাশ ফেরে কিনা সন্দেহ।

ভোর হয়। বেলা বাড়ে। তার যেন নেশা ছুটতে চায় না। তবে তার মনে হয়, সারা শরীরটা যেন অনেক চাঙ্গা হয়েছে। ব্যথা-বেদনা কমেছে যথেষ্টই।

সে একবার উঠে বসে, আবার শুয়ে পড়ে। গায়ের আড়মোড়া ভাঙে বার কয়েক। অনেকক্ষণ সে শান্তিতে থাকতে পারে না।

নির্লজ্জ ক্ষুধায় আবার তাকে প্রহার করে। গতকল্যের মত নিষ্ঠুরতা। সে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে যেতে চায়। এ চরম তাড়না তার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব।

সে গিয়ে নিকটের পরগাছা-ঘেরা একটা ঝাঁকড়া বড় আমগাছে ওঠে। ওখান থেকে গ্রামের পথ ঘাট সম্পূর্ণ দেখা যায়। ও একটা রক্ত-পিপাসু চিতা বাঘের মত ওৎ পেতে অপেক্ষা করে। যদি কেউ আহার্য নিয়ে গ্রামের পথ ধ'রে এই জংগলের পাশ দিয়ে আসে—ফল মূল দই চিঁড়ে পানি পান্তা যা হোক—

জঙ্গলের পাশেই একটা জীর্ণ দেবালয়। তার ধার দিয়ে এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া যাওয়ার কাঁচা এক ফালি সরু পথ মোড় ঘুরে গেছে। গোপী শ্যেনদৃষ্টি মেলে থাকে।

একটি বিধবা স্ত্রীলোক সেই পথেই এগিয়ে আসছে। সংগে একটি বালক।

এখন পারবি তো?

হ্যাঁ, খুব পারব পিসীমা।

কাঞ্চটা ফেলে দে। এখন হাওয়ার সংগে যুদ্ধ না ক'রে, পরে এসে

করিস। ধর্ এই দুধের ঘাটিটা আর কলা পাঁচটা। ঠাকুর-বাড়ি দিয়েই চ'লে আসবি।

আচ্ছা।—বালকটির সুকুমার মুখের প্রধান সৌন্দর্যই তার দীর্ঘায়ত চোখ-জোড়া। অপূর্ব ভংগিতে সে আস্ফালন ক'রে কঞ্চিরূপী কিরিচ চালাচ্ছে অনুপস্থিত প্রতিপক্ষের গায়ে।

তবে ধর্।

এই যে, দাও।

এখনও তো কঞ্চিটা ফেললি নি, কাপড়ও পরলি নি ক'ষে? বীরপুরুষ, খুলে পড়লে যে দেখা যাবে সব।

না, না, তুমি সব সময় অমন করলে আমি যাব না দুধ কলা নিয়ে। আমি পারব না, পারব না পিসীমা।—বালক ঘুরে দাঁড়ায় অভিমানে।

গোপী বিরক্ত হয়।—এত দেরী করছে কেন অবাধ্য বালক?

না বাবা, না। তোমার কি কাপড় খুলে যেতে পারে? বড় হ'লে তুমি যোদ্ধা হবে ভীষ্মের মত। এবার যাও দেখি, ধর তো এগুলো।

ছেলেটি তবু গনগন করে এবং ঝাড়ে বংশে নির্মূল ক'রে ছাড়ে পথের পাশের কচুগাছগুলো।

ও কি হচ্ছে ডাকব নাকি তোমার কাকাবাবুকে?

কই পিসীমা, কাকাবাবু কই? দাও শীগগির আমার হাতে দাও না ওগুলো।—কি কারণে যেন পলকে একেবারে শান্ত হয়ে যায় বীর যোদ্ধা।

দেখিস যেন দুধ না প'ড়ে যায় চলকে। বড্ড দেরী হয়ে গেল। একটু তাড়াতাড়ি যাস বাবা। পূজো না শেষ হয়ে যায় ঠাকুরমশাইয়ের। ওদিকে ছিষ্টি প'ড়ে রয়েছে, আমি চললাম। হ্যাঁ রে, কি বলবি বল্ তো ঠাকুর-বাড়ি গিয়ে?

বলব, বলব। দাঁড়াও—

এর মধ্যেই সব ভুলে মেরে দিয়েছিস ? কি যে ছেলে তুই !

কি যেন ভেবে গোপী সরসর ক'রে নেমে পড়ে গাছ থেকে। ভাঙা মন্দিরটার পিছনে একটা ঝোপের ভিতর গিয়ে সে থাকে আড়ি পেতে।

বলবি যে, পিসীমা মা-শীতলাকে উচ্ছুগ্যু ক'রে দিতে বলেছে— বুঝলি ? তার হাতে অনেক কাজ, নিজে আসতে পারল না।

আচ্ছা। এবার আর ভুলব না, তুমি বাড়ি যাও।

আর একটা কথা, ঘটিটা কিন্তু এক্ষুণি ফিরিয়ে নিয়ে আসবি। তোর কাকাবাবুর বিয়ের দান-সামগ্রীর ঘটি ওটা।

বালক মাথা নাড়ে—হুঁ।

সে তার স্বভাবসুলভ নানা রকম অংগভংগি করতে করতে মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসে। এত যে পিসীমার হুঁশিয়ারী সব ভুলে যায়। অতটুকু পথ অতিক্রম করতে তার বেশ খানিকটা সময় লাগে। তার আয়ত চোখ কখনও বিস্ময়ে বিস্ফারিত, কখনও যেন ভয়ে ভাবনায় অর্ধ-নিমীলিত। জগতের যা কিছু কৌতূহল সময় সময় যেন পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে সমস্ত মুখমণ্ডল ভ'রে।

এমনি ছিল জীবন।

ক্ষুধার্ত গোপী যত এগিয়ে যায়, ততই নাটকীয় সংঘাত অনুভব করে অন্তরে। এখন সে কি করবে ?

দেবালয়ের কাছে এসে বালক দুগ্ধপূর্ণ ঘটি ও কলা কটি কি যেন ভেবে নামিয়ে রাখে। সে চতুর্দিকে তাকায় ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে। তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে একটি বন্য পাখী। বালক কান পেতে শোনে তার ডাক—বউ কথা কও, বউ কথা কও।

এ পাখির ডাকের ইতিহাস ছেলেটি জানে। ওর যেন প্রাণ পুড়ে

যায়। শ্বাশুড়ীর তাড়নায় কবে যেন বৌ হলুদ মেখে পাখি হয়ে পালিয়ে গেছে।

গোপীর মনের ভিতর হিংস্রতা ও মানবতা বোধ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ওর অন্তরলোক টলমল ক'রে ওঠে। ও কিছুতেই থামাতে পারে না কারুকে। হয়রান হয়ে গোপী নিশ্বাস ফেলে ঘন ঘন।

বালকটি একটু দূরে সরে যায়। অমনি পট পরিবর্তন ঘটে। গোপী নিতান্ত অনিচ্ছায়, কিন্তু দুর্লঙ্ঘ্য আদেশে যেন খাদ্যদ্রব্যগুলো টেনে আনে। ঢক ঢক ক'রে দুধটুকু খেয়ে ঘটিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কলা কটা সাবাড় করে কয়েক কামড়ে।

গোপী এবার বনান্তরে ডুব দেয়।

ইতিপূর্বে গোপীর নিকট সূর্যের এত আলো, বনের সবুজ শ্রী, তার স্নিগ্ধছায়া মনে কোনো রেখাপাত করে নি। বিশ্বজোড়া রূঢ়তা এবং রিক্ততাই ওকে কেবল পীড়া দিয়েছে। দৃষ্টির সুমুখে ওর নর্তন করেছে অলীক রঙিন গোলক। শান্তি নেই, স্বস্তি নেই—আছে শুধু জ্বালাময় অনুভূতি। প্রতি অণু-পরমাণুতে অনির্বাণ শূন্যতার দাহ।

গোপী একটা আধমরা ডালের ওপর ব'সে রয়েছে। কিছু ও ভাবছে না, শুধু অনুভব করছে সারা দেহে আনন্দ। যে কীটগুলো ওর শরীরটা কুরে কুরে খাচ্ছিল, সেগুলো যেন এই মাত্র মারা গেছে।

দেহের সংগে মনের কি এক আশ্চর্য সম্বন্ধ! শুভ অনুভূতিগুলো যেন ধীরে ধীরে অঙ্কুর মেলছে—যেমন সামান্য জলের স্পর্শে বীজধানে দেখা দেয় প্রাণচাঞ্চল্য।

বেশিক্ষণ গোপী বসে থাকতে পারে না। ওকে উঠতে হয়। ফিরে আসতে হয় ভাঙা মন্দিরটার কাছে। খোঁজ নিতে হয়, বিপন্ন বালক কি করছে!

ছেলেটি তো রাস্তার ওপর নেই। বউ-কথা-কও পাখিটাও তো উড়ে গেছে। গোপী চারিদিকে ব্যগ্র দৃষ্টিতে অন্বেষণ করে। তবে কি বালক বাড়ি ফিরে গেছে? তা যদি গিয়ে থাকে, তবে তার চরম লাঞ্ছনার হাত থেকে নিশ্চয়ই অব্যাহতি নেই। যে কাকাবাবু তার!

এ গোপী কি করেছে?

সে তো তখনই আর ম'রে যেত না। উচিত ছিল তার আরও সংযত হওয়া—উচিত ছিল তার আরও প্রলোভন দমন করা।

অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে গোপী।

এমন সময় তার কানে যা যায়, তা বিশ্বাস করা অসম্ভব। কিন্তু নগ্ন সত্যকেই বা মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেবে কি ক'রে?

সে মন্দিরের ফাটলে কান পেতে থাকে।

ওগো, শিবঠাকুর!—সেই বালক নতজানু হয়ে মিনতি জানাচ্ছে, আমি আর বউ-কথা-কও পাখির পিছে ছুটব না, কক্ষনো আর শ্যাওড়া ফলের ওপরও লোভ করব না—বড় বড় টোপা টোপা হ'লেও না। গুরুজনের কথা শুনব মন দিয়ে, এবারটি তুমি আমায় ক্ষমা কর শিবঠাকুর!

বালকের গলা আরও আর্দ্র হয়ে আসে। সে আরও গাঢ়কণ্ঠে বলে, তুমি না হয় দুধটুকু খেয়ে ঘটিটা ফিরিয়ে দাও। ওটা আর কারুর নয়, কাকাবাবুর ঘটি। ওটা পেলে কলার কথা আর আমি তুলবই না। ওগো শিবঠাকুর···। বালক বারম্বার যুক্ত করে প্রণাম করে।

গোপী লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে। কিন্তু সে ফাটলের কাছ থেকে কান ও চোখ সরিয়ে নিতে পারে না।

ছেলেটি মন্দির থেকে বেরিয়ে যায়। একটু বাদেই ফিরে আসে। তার হাতে কতকগুলো কনকধুতুরা। সে বিগ্রহকে সাজায় সযত্নে।

গোপী এখনও তো একটা বিরাট ভুল করল। সে তো ঘটিটা খুঁজে নিয়ে এসে চুপটি করে রেখে আসতে পারত শিবমন্দিরে। ওর জীবন যদি এমনি বিপদে পড়ত !

ফুল আনতে একটা নেবু-কাঁটায় ছ'ড়ে গেছে আমার হাত, এই দেখ—রক্ত। পিসীমা রাগ করবে। বড্ড দেরী হয়ে গেছে। আমি চোখ বুজলাম, এখন ঘটিটা ফিরিয়ে দাও ঠাকুর। ওগো আমার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে !—বলতে বলতে বালকের কণ্ঠরোধ হয়ে আসে।

এমন অপূর্ব সুযোগও গোপী গ্রহণ করতে পারে না। সে বিবশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পরম মুহূর্তগুলি বৃথা গত হয়ে যায়।

পিছন থেকে গায়ে হাত পড়তেই বালক চমকে ওঠে। বলে, তু-তু-তুমি –কাকাবাবু—

ওঃ, কি খোঁজাটাই খুঁজেছি, গ্রামসুদ্ধ, তোলপাড়। আর তুমি হারামজাদা এই মন্দিরে ভিতর ফুল নিয়ে খেলছ ! দুধ কোথায়, কলা ?

জানি না কাকাবাবু, আ-আ-আমি –

বল্ শীগগির দুধ কোথায় ফেলেছিস ? ঘটিটা ?

গোলমাল শুনে কয়েকজন কৃষক ও রাখালবালক ছুটে আসে। ডাক-পিওন বিটে যাচ্ছে, সেও এসে দাঁড়ায়। বলে, কি হয়েছে মুখুজ্জেমশাই ?

আর বল কেন এই বাপ-মা-খাওয়া তেঁতুলবিচি আমার হাড় মাংস জ্বালিয়ে খেল ! বল্ শূয়ার, ঘটিটা কোথায় ?

বলি বলি, তুমি আমায় মেরো না কাকাবাবু, মেরো না—

বালকের আর কোনও কিছু বলা সম্ভব হয় না।

উদ্যত ছড়িটা এক হাতে ঠেকিয়ে, অন্য হাতে ঘটিটা এগিয়ে যে দেয়, তাকে পাশের গাঁয়ের উপস্থিত সবাই অনায়াসে চেনে। ওকেই নাকি সন্দেহ ক'রে চতুর্দিক চ'ষে বেড়াচ্ছে স্থানীয় পুলিস।

॥ কসাই ॥

পচা বাসি রক্ত জল ও গোবর ইত্যাদির একটা দুর্গন্ধ আসছে। ভনভন করছে মাছি চারদিকে। কুট্টি লুংগিখানা পরে শক্ত করে জড়িয়ে। লম্বা ছুরিখানা ধরে বাগিয়ে। তীক্ষ্ণ ছুরি ঝলসে ওঠে ভোরের আলোতে।

এখন খদ্দের এলেই হয়! ঝড়াক করে মারবে ঘা—হাড় সমেত মাংস খসে আসবে এক তাল। তারপর যে যত পার নাও। টাটকা মাল—একেবারে সন্ত জবাই দেওয়া চিজ। চক্‌চক্‌ করছে হল্‌দে হল্‌দে তেল।

'আরে লেও, লেও ঘি চপ্‌চপ্‌।' কুট্টি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, আর আড় চোখে চায় পাশের দোকানীর দিকে। কুট্টির লক্ষ্য দোকানী নয়, কিংবা তার দোকানের ঝুলান চওড়া চওড়া মাংসখণ্ডগুলিও নয়—একটি যুবতী খদ্দের এসেছে। বেশ মাজা ঘষা চেহারা, দাঁতে মিশি ও সোনার পিন বসানো। কুট্টির মন মত, আন্দাজ সই।

কুট্টি হিংসায় জ্বলে যায়, আর চেঁচায়, 'বাসি মাল নয়, এক্কেবারে ঘি ছলছল—সের পাঁচ সিকে। খদ্দের লক্ষ্মীরা দেখে লিও।'

একটি বৃদ্ধা এগিয়ে আসে, 'দে তো এক পো মেপে।'

'কত দেবে?'

'কেন, পাঁচ আনা।'

মুখটা কুঁচকে কুট্টি বলে, 'পাঁচ আনা! সের পাঁচ সিকে—ভেবেছ বুঝি পচা গোস্ত। তা আমার কাছে নেই নানী।'

'তবে যে এই মাত্তর বললি, খদ্দের ডাকলি মুখপোড়া!'

'লালুভাইর জন্যে খদ্দের ডেকেছি, বেচারির দোকানের গোস্ত পচে যাচ্ছে কিনা কাল থেকে—সস্তা ছেড়ে দিতে বলছি তাই। আমার দোকানের মাল টাটকা। দামও দিতে হবে পুরোপুরিই দেড় টাকা, এক পয়সাও রেহাই নেই।'

বুড়ী বিড় বিড় করে বকে সরে যায়।

লালু চট করে জবাব দেয়, 'তোকে মোড়লী করতে হবে না কুট্টি। তোর তো মরা গোস্ত, বেচে ফেল পাঁচ সিকে লয়ত টাকা টাকা দরে। আমারটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখই না তুমি, দামড়া একেবারে। খুন ঝরছে এখনও।' জিতে গেল ভেবে লালু হাসে একটু। তারপর ধীরে ধীরে যুবতীর কাছে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার পছন্দ কোনটা?'

যুবতী বলবে কি! সে খিল খিল করেই অস্থির। কোমর দুলায় এক আধবার, কিন্তু ভাল করে পরখ করে মাংস আঙুল দিয়ে টিপে টিপে।

কুট্টি সমস্তই দেখে—জ্বলে তেলে-বেগুনে। এই বুঝি মেয়েটি কিনল মাংস। কতটা কিনবে? পাঁচ সেরও তো কিনতে পারে। ও কি এখানে ফিরে আসতে পারে না অপছন্দ করে? নিশ্চয় পারে। কিন্তু একান্তই যদি না আসে, কুট্টি তো আর হাত ধরে টেনে আনতে পারবে না!

মেয়েটির জন্য মোটেই দরদ নেই কুট্টির। ও ছুঁড়ি না হয়ে বুড়ী হলেও কিছু এসে যেত না এই কসাইর। ও যে ঐ বাজারের পাশের বস্তিটার কুটনি—সময়তে করে ঝি-চাকর-অভিভাবিকার কাজ, সকাল বেলার একটা বিশিষ্ট খদ্দের। নিশ্চয় গোস্ত কিনবে অনেকখানি।

লালুর দোকান ছেড়ে মেয়েটি এগিয়ে আসে কুট্টির দোকানের দিকে।

একেবারে লাফিয়ে ওঠে কুট্টি ছুটো ছুরি ঘষতে ঘষতে। 'লেও লেও, দেখে-শুনে যাচাই করে লেও খদ্দের লক্ষ্মীরা।'

'কত করে?'

'ডেড় টাকা সের।'

'ইস!'

প্রথম হেসে হেসে জবাব দেয় কুট্টি, তারপর তার হয় রাগ। কি ক'রে সে সস্তা দেবে? কবর থেকে ওর বাপ উঠে এলেও পারবে না। যতই মেয়েটি হাস্থক না কেন, তাতে মাংসের দর কমান চলবে না। ওর পড়তাই প'ড়েছে বিষম। এই রায়টের সময় হিন্দুর সাহায্য ছাড়া তো পাড়াগাঁ থেকে মাল কেনা এক রকম অসম্ভব। এর জন্ম হিন্দু দালালদের কি ও আক্কেল সেলামী দিয়েছে কম! এত দুঃখের কথা বুঝিয়ে বলা যায় না খদ্দেরকে—তাই মনের ভিতরটা ফুটতে থাকে টগবগ করে।

মেয়েলী গলায় মিষ্টি প্রশ্ন হয়ঃ 'কি, এখনও দেখ ভেবেচিন্তে—লেব কিন্তু পাঁচ সের।'

'ভাগো এখান থেকে—লালুর ঐ পচা মালের কাছে যাও।'

'তবে চললাম কিন্তু।' বলেও একটু দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েটি।

মাছি তাড়াবার উপলক্ষ ক'রে খানিকটা জল ছিটিয়ে দেয় কুট্টি মেঝেতে। সে জলের ক্রিয়া হয় বিষম। সেই বৃদ্ধার চাইতেও এই যুবতী ছোবল মারে জাত কেউটের মত।

কুট্টি চেয়ে চেয়ে দেখে যে লালু মাংস বেচল পাঁচ সের। সত্যি সত্যিই দিল কম দামে।

লালু কি করে দেয়? ও নিপুণ হাতে পচা গোস্ত ভেজাল চালায়।

কুট্টির কামড়াতে ইচ্ছা করে নিজের হাত পা। ওর দোকানেও তো অমনি বাসি পচা আড়াই সের ছিল।

ভোরবেলাটা মাটি হয়ে যায় কুট্টির। ভাল খদ্দের আর একটিও আসে না।

কিন্তু লালুর দোকানে আবার ফিরে আসে সেই মেয়েটি। আবার নেয় আড়াই সের।

ঐ বড় বাড়িতে কি যেন উৎসব আছে। সেই বাড়িতেই মেয়েটি আজ ঠিকা কাজ করছে। হঁ্যা, এইমাত্র তো এল ঐ দিক দিয়ে। ঐ বড়ওয়ালাদের জন্যই মাংস।

আহা-হা, কুট্টি কি সুযোগটাই না নষ্ট করল! একেবারে তার নাকের ডগাটা ছুঁয়ে যেন চলে গেল পাখিটা। ও বুঝে সুঝেও ধরতে পারল না।

ও হলে দিত একেবারে বার আনী ভেজাল চালিয়ে।

ঐ বড় বাড়িওয়ালাদের ওপর ওর ক্রোধ অপরিসীম। আজ না হয় ও এই দোকান করেছে। কিন্তু একেবারে শিশুকাল থেকে ও গোলামী করেছে হরেক দোতলা, তেতলা বাড়িতে। খেয়েছে শুধু লাথি-ঝাঁটা। কুকুরের মত দূর দূর করেছে ওর সমবয়সী ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত। ওর হাড়ে হাড়ে সে সব দাগ কেটে বসে আছে। আজ কি সুবিধাটাই ও হারাল! লাভও হত, আক্রোশও মিটত খানিকটা।

কুট্টির বুক শুকিয়ে যায় ভুঁইয়াবাবুদের কিস্তির কথা ভেবে। সন্ধ্যাবেলাই এসে হাজির হবে দারওয়ান। শালার কি গলা! বাঁটোয়ারার পর বেশখানিকটা উঁচু পর্দায় উঠেছে। কসাইর কাছে পয়সা খাবে, তবু রোয়াব ছাড়বে না। আবার ফোঁটা দেবে কপালে

লম্বা করে! কুট্টি ঘৃণায় খানিকটা থুথু ফেলে। মাছি তাড়ায় অন্যমনস্কভাবে।

রোদ চড়ার সংগে সংগে পচা গন্ধটা তীব্র হতে থাকে। কুট্টির মগজটা ঝিমঝিম করতে থাকে শ্রাবণ মাসের পাড়া-গাঁয়ের অন্ধকার রাত্রির মত।

এ ছুনিয়ার কেউ সাচ্চা নয়। সাচ্চা কথার দিন নেই এখন। বড় বাড়ির কাজে যেম্‌নি মাথা গলিয়েছে ও, অমনি হয়েছে বজ্জাত। নিল না তো নিলই না ভাল মাল। কিছু হাত সাফাই করবে নিশ্চয়।

কি স্পর্শ দোষ! ঐ বড়ওয়ালাদের সংস্রবে এলেই তোমার মনটা হবে ছোট—যেন জোর করেই কে হাত ঠেলে দেবে, এ চুরি না করলে তোমার কিছুতেই রেহাই নেই।

কুট্টির অভিজ্ঞতা আছে বিস্তর।

সবই ও বোঝে, কিন্তু ও কেন জানি একেবারে নিষ্কৃতি দিতে পারে না ঐ কুটনি মেয়েটাকে। বেলা বাড়ার সংগে সংগে ওর চিন্তা আরও যেন যায় বিকৃত হয়ে জড়িয়ে। মেয়েটার শাড়ীর লোভানি, দাঁতের ঝকমকি যায় বিকৃত বিস্বাদ হয়ে।

ছুপুরবেলা আজ আর দোকান বড় করে না কুট্টি—যদি ছু একজন খদ্দের আসে। পশ্চিম দিকটা পুড়ে যাওয়ার যোগাড় হয়েছে সূর্যের তেজে। সেই পশ্চিমমুখিই ওর দোকান। আকাশে মেঘ নেই; বিবর্ণ তামাটে একটা তপ্ত তাওয়া যেন। সেই শূন্য তাওয়াটায় ঘুরপাক খাচ্ছে ছু একটা শকুন নয়ত চিল। বিনা তেলে কে যেন তৈরী করছে পাখির গোল-কাবাব। এ হোটেলওয়ালা কে?

মাছি বেড়েছে আরও। গতকালকের মাংসগুলো এখন যা হয়েছে, তা আর বলার নয়। আর কিছুক্ষণ বাদে ও-ই হয়ত সইতে পারবে না

গন্ধ। ওর বমি বমি করে অন্তর, কিন্তু মন পোড়ে শিক-কাবাবের মত।

ও চটের পর্দাটা টেনে দেয় ভাল করে। তারপর কিনে আনে 'হফ-কপ' চা।

চা খাবে কি, ওর চোখে জল আসে।

দোকান যার ওপর দাঁড়িয়ে, সেই কিস্তির টাকা বাকি আজ সাত দিন। টাকায় বছরে স্থদ কমসে কম বার আনা। এত চড়া স্থদে কোনো মানুষে টাকা ধার করে! কিন্তু ওদের মত নিঃসম্বলের উপায় কি? ও কর্জ্জ করেছে কুড়ি টাকা। প্রত্যহ দিতে হয় কুড়ি পয়সা—দু'মাস বার দিন। পাঁচ সাততে পঁয়ত্রিশ আনা ওর বাকি পড়েছে, এখন পর্যন্ত আমদানী হয়েছে মাত্র পাঁচ সিকি। সারা দিনের দোকান ভাড়া, শান পালিসের পয়সা ইত্যাদি দিয়ে থাকবে কি? এবার ওর স্বাধীন কারবারের বরাতে লালবাতি জ্বল্‌ল।

সাধে কি কসাইর চোখে জল আসে! আবার গোলামী!

তবে এখনও একটু ভরসা আছে, রয়েছে শেষবেলার মরস্থম। 'খোদা মেহেরবানী ক'রো এই এতিমকে (অনাথকে)।' একটু বল সঞ্চয় করতে চেষ্টা করে কুট্টি। গোটা কয়েক ঘন ঘন চুমুক দেয় 'হফ-কপ' চাতে। আর মনে মনে ভাবে একখানা 'কোরান সরিফ' কিনবে কিছুটা স্থবিধা হলে।

অবশেষে শেষ বেলার মরস্থম আসে বটে।

পালে বাঘ পড়ে যেন তখন।

শোনা যায় ছুরি চলছে নাকি মানিকতলা মুসলমান বস্তিতে। কেউ বলে, না, না, আগুন দিয়েছে গুণ্ডারা। কেউ বলে, রাঁধতে গিয়ে বাঁশের বেড়ায় এমনি আগুন লেগেছে।...

হু হু শব্দে দৈত্যের মত দমকল ছুটে যায় গোটা দুই।

ঝপাঝপ ঝাঁপ পড়ে মুসলমানদের দোকানের। হল্লা হয়ে গেল চারদিকে, রায়ট, রায়ট।

দোকান বন্ধ করে লাফিয়ে পড়ে কুট্টি। হাতে পেলে এক্ষুণি হয়ত ছিঁড়ে ফেল্‌ত কোরান সরিফ!

অপরাহ্ণের সোনালী মরসুম গত হয়ে যায় বিফলে!

সন্ধ্যার একটু আগে সবাই বোঝে এ গুজব। দোকান খোলে মুসলমানরা।

কিন্তু কুট্টি কি করবে? এখনই তো আসবে কিস্তিওয়ালার ফোঁটা তিলক কাটা শয়তান দারওয়ানটা। শালার চেহারা দেখলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় একেবারে।

এই ধাক্কায়ই ওর দোকানটা গেল।

ফের গোলামী, কসাইর বুক ঠেলে আবার কান্না আসে।

একটা জামা গায়ে দিয়ে কুট্টি সরে পড়ে। হাঁটতে থাকে যেদিকে দু'চোখ যায়।

ছেঁড়া হলেও জামাটা ফুল-কাটা চুড়িদার। এইবার হাসি পায় কুট্টির। পকেটে আছে মাত্র পাঁচ সিকি। পেটটা তো করছে দুপুর থেকেই চোঁ চোঁ।...

এখন ও যাবে কোথায়? পথে পথে আলো জ্বলছে অজস্র। কিন্তু ওর কাছে এ দুনিয়াটা আঁধার। শৈশবে ও পিতামাতার মুখ দেখেনি, কৈশোরেও কোনো বন্ধু ওকে হাত বাড়িয়ে দেয়নি, যৌবনে পায়নি কোনও নারীর পরিচয়। ও শুধু অনাথ নয়, ভাগ্যহীন।

একটা গোরস্থানের কাছে এসে বসে পড়ে কুট্টি। মন মরা হয়ে চুপচাপ করে থাকে অনেকক্ষণ। ওর যখন স্বাধীনতাই নষ্ট হতে

বসেছে, তখন ও-তে আর মৃতে তফাত কি? আবার কুট্টি নফর হবে দোকানপাট খুইয়ে—উঃ, এ নিতান্ত অসহ্য!

কয়েকটি বাবু এসে বসে তার থেকে একটু দূরে। এরা দিনে পড়ে, নয়ত চাকরি-বাকরি করে, সন্ধ্যাবেলা বেচে কাগজ। তারা বলাবলি করে যে, সারা দুনিয়ায় যেমন ডামাডোল, তাতে মেহনতি জনতার স্বাধীনতা রোখে কে? কিন্তু তাদের এক হতে হবে। ভাবতে হবে, শিখ্তে হবে সারা দুনিয়ার মজুরের সংগে তাদের নখে মাংসে সম্পর্ক। আরও অনেক কথা বলে তারা। হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন যেন তাদের কাছে কিছুই নয়। এই মাত্র কোন্ কোন্ হিন্দু বন্ধু যেন খেয়ে এল শামসুদ্দিনের ভগ্নীর সাদির নিমন্ত্রণ। শুধু ওদের সংগে তফাত বড়ওয়ালাদের।

কুট্টি রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

'তবে বাঁচতে হলে খাটতে হবে।' বলে একজন।

কুট্টি উত্তেজনায় এগিয়ে এসে দাঁড়ায় ওদের পিছনে।

সবাই চমকে উঠেই ফিরে তাকায়। কে এ? কেন ও অমন করছে?

কুট্টি এক নিঃশ্বাসে ওর সারাজীবনের দুঃখের কথা বলে যায়। বাবুরা সান্ত্বনা দেয়, আর ওর বুকে আশার বর্তিকা জ্বালায় মহা দরদে।—'অত অধীর হয় না ভাই সাহেব, অত অধীর হতে নেই।

বাবুরা চলে যায় যে যার বাড়ির দিকে।

চাঁদ ওঠে কারখানার পাঁচিলের পূবদিকে জুড়ে। থালার মত চাঁদ—মালার মত তারা দেখা যায় আকাশে।

একগুচ্ছ ফুল নিয়ে কুট্টি উঠে দাঁড়ায়। জ্যোৎস্নার জোয়ার থেকে যেন কুড়িয়ে নিল ফুল—সুগন্ধি হাসনুহানা। চল্ল সিনেমার দিকে—

দেখবে 'ছুলারী কা দিল' ছবিখানি। বাকি দশ আনার সে খাবার কিনে খাবে। তারপর কাল যা হবার তা হবে। আজ ওর আনন্দ করা চাই।

দেরী হয়ে গেছে—সোজা একটা গলি দিয়ে এগিয়ে চলে কুট্টি। সেই সস্তা বারবিলাসিনীদের বস্তির পথ। অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে পচা ছুর্গন্ধে ভরা।

'কাঁদছে কে, তুমি কেগো?' দিয়াশলাই জ্বালায় কুট্টি ধাক্কাধাক্কি হয়ে যাওয়ার ভয়ে।

এ যে দিনের সেই গরবিনী কুটনি মেয়েটি!

সকল কথা ভুলে গিয়ে কুট্টি জিজ্ঞাসা করে অত্যন্ত সহানুভূতিতে, 'কি হয়েছে তোমার?'

'ওরা সারা দিন খাটিয়ে, মেরে বিদায় করে দিয়েছে সাঁঝের ওক্তে (সময়ে)। এক ছড়া হার চুরি গেছে, তাই নাকি নিয়েছি আমি! তুমিই দেখে যাও না কুট্টি ভাই, আমার ঘরে আছে নাকি এক রতি সোনা?'

মেয়েটি অবলীলাক্রমে কুট্টির হাত ধরে টানে। কুট্টি বলে, 'জানি শালাশালীদের কারসাজি। ওরাই কেউ ঝেড়েছে, রেস-টেস খেলবে নয়ত মাগী বাড়ি যাবে, দোষ চাপালে তোমার ঘাড়ে। বলতে বলতে কুট্টি এগিয়ে গিয়ে ঘরে ঢোকে মেয়েটির টানে।

ব্যবসার খাতিরে এই নোংরা পল্লীতেও একটু ঝকঝকে তকতকে বিছানা। গোছগাছ ঘরখানি। শুধু এটা ও-টা করে তো আর পেট ভরে না—করতে হয় হাজারও রকম আত্মহত্যা। তারই আয়োজনে এ সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।

কুট্টি সিনেমার কথা ভুলে গিয়ে বসে পড়ে বিছানায়।

কিস্তির পয়সা ভেঙে আনে আলুর চপ, ফুলুরি আর গরম গরম মুড়ি।

দু'জনে খায় পেট ভরে। অনেক দিনের পরিচয় ওদের, কিন্তু আজ যেন নিবিড়তা অনুভব করে অপরিমেয়।

কুট্টি বকর বকর করে যায় একটানা। যার মাথার ওপর বলতে গেলে খাঁড়া ঝুলছে, তারই মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সকাল বেলার রোদ-পড়া টাটকা একদলা মাংসের মত। কুট্টি বলে, মেহেনতি জনতার স্বাধীনতা রোখে কে? সে বোঝায় আরও অনেক কথা। জ্বালায় আশার দীপ সেই বাবু কটির মনের আগুনে।

উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয় মেয়েটির চোখের তারা। একি উত্তেজনা, একি আনন্দ! খানিক থাকে মেয়েটি তন্ময় হয়ে। ওর মনময় কোন স্যাঁকরা যেন বিয়ের জরুরী গড়নের হাতুড়ি চালাচ্ছে।

কাপড় বদলে পান খেয়ে কাছে আসে মেয়েটি। কুট্টির ওর খোঁপায় গুঁজে দেয় কবর থেকে চয়ন করা ফুল।

বাইরে পচা গন্ধ, ভিতরে হাসনুহানা মদিরা ছড়ায়। দুপুর রাত্রের চাঁদ উঁকি মারে ভাঙা চালের ফাঁকে।

কুট্টির বকবকানিতে দক্ষিণের ঘর থেকে আসে খেঁদি খদ্দেরকে ফাঁকি দিয়ে। টগর আসে ভিস্তিওয়ালার জিম্মায় খেনো মদের বোতলটা রেখে। আরও আসে অনেক,—কেউবা লম্ফ হাতে, কেউবা অর্দ্ধেক আদুল গায়। সেমিজ সায়া পরার সময় কই!

খানিকের জন্য সমস্ত কাজ-কারবার বন্ধ থাকে এই নোংরা বস্তির।

সকলে বিস্ময়ে নির্বাক। বলে কি কুট্টি, একি বিশ্বাস করার মত সংবাদ? কান্নর কারুর চোখে ঝাপসা হয়ে আসে।

বাইরে পচা গন্ধ, ভিতরে আজ কিসের সুবাস, দুপুর রাত্রের চাঁদ কেন উঁকি মারে অমন ক'রে?

একটা টিকটিকি টক টক করে ডেকে ওঠে। কে যেন অন্যমনস্ক ভাবে তিনটা তুড়ি দিয়ে বলে, সত্য, সত্য—সত্য!

॥ বনলতা সোম ॥

বনলতা সোম চিঠি লিখেছে—

সরকারের সংগে কোনও সংশ্রব নেই, নিতান্তই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

চৌকা চৌকা পাথরের মেজে। লম্বা একটানা একটা গুদাম। ওপরে কালো করগেটের ছাউনি। বৈদ্যুতিক কোনও পাখা নেই। দুপুরের রোদে যেন ফারনেস হয়ে রয়েছে অন্দরটা।

তার ভিতর একখানা মেয়েলি হরফের চিঠি।…

একটানা গুদামের এক প্রান্তে একখানা টেবিল ও চেয়ার একটি। কখনও জাহাজ থেকে, কখনও বা রেল থেকে মাল এসে জমা হচ্ছে, আবার উধাও হয়ে যাচ্ছে বাজারে। গুটি দুই বাবু, শ দেড়েক কুলি এবং খান দশেক লরি—এর উর্দ্ধতন কর্মচারী সত্যবন্ধু ভৌমিক, বি-এ, চেয়ারে বসে। পিছনে ছোট্ট একটা বোর্ডে লেখা, ম্যানেজার!

ঝপাঝপ মাল এসে পড়ছে আবার লরি বোঝাই হচ্ছে—মেশিনেরও বোধহয় বিরতি আছে, কিন্তু এদের বুঝি বিশ্রাম নেই। বলতে গেলে নিশ্ছিদ্র দশটা পাঁচটা—কোনও কোনও দিন রাত সাতটা। ভাতা, মাইনে একই। মন্দার বাজার, ছাঁটাইর হিড়িকে, অত হিসেব চলে না।

সবচেয়ে পরিশ্রমী যারা, এই কুলিদের মাইনে ত্রিশ, বাবু দুটির ষাট, আর গ্র্যাজুয়েট ম্যানেজারের একশ পঁচিশ। গ্রেড নেই, বোনাস নেই, শুধু গালভরা পদবী আর মাথা বোঝাই দায়িত্ব।

একটি মাল এদিক ওদিক হলে চাকরী যাবে, এমন কি পুলিশ পর্যন্ত টানা-হেঁচড়া করতে পারে। দায়িত্ব এবং শ্রেণীভেদ করার জন্যই তো এত মাইনের তারতম্য। ইংরেজ অনেক দিন এদেশ ছেড়েছে কিন্তু তার নীতিটুকু এদেশীয় প্রভুদের রক্তে মিশিয়ে দিয়ে গেছে—অনেকটা যৌনব্যাধির বিষের মত।

তবু বনলতা সোমের চিঠি এসেছে—সুগন্ধি খামে।

ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেছে। অবকাশ পাচ্ছে না সত্যবন্ধু। একটু নিরালায় গিয়ে চিঠিখানা খুলতে চায়। নানারকম হিসেবের কাগজপত্র। দেখেশুনে ডাকে পাঠাতে হবে। প্রত্যেকটাই অত্যন্ত জরুরী। একটি শূন্য এদিক ওদিক হলে সর্বনাশ। ম্যানেজারের ম্যানেজারী নিয়ে টানাটানি।

বনলতা সোম নাসারন্ধ্রে একটা মেয়েলি সুবাস ছড়িয়ে যাচ্ছে। ক্রমে মস্তিষ্ক যেন ভরে উঠেছে ভৌমিকের। এবার ভৌমিক কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সই করে যেতে থাকে দ্রুত। হাত চলে তো না যেন সেলাইয়ের কল চলেছে একটা।

বনলতা! বনলতা! সোনালী লতার মত ভৌমিকের সমস্ত কর্মরত আবেষ্টন যেন জড়িয়ে ধরে।

'এই নাও তেওরী ডাক নিয়ে যাও।' কাগজপত্র ঠেলে ভৌমিক উঠে পড়ে।

নিরালা নিভৃত কোণ কোথায়? মালের স্তূপের পাশে পাশে ঘর্মাক্ত কুলিদের চীৎকার। বাইরে মোটর লরির হর্ণ। এমন সময় দমাদম খালি বস্তার বাণ্ডিল এসে পড়ে। ধুলোয় গন্ধে সারা গুদামটা এক অব্যক্ত ভাব ধারণ করে।

সোয়া'শ টাকা মাইনের ম্যানেজার ত্রিশ টাকার কুলিদের দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে। 'এখানে নয় ওদিকে লে যাও।'

আবার হয়রানী! কুলিরা আশ্চর্য হয়ে যায়! প্রায় এক লরি মাল তো জায়গা-বদল করা সহজ নয়। একটা শুকনা জ্বর-গায় কুলি করুণ নেত্রে চেয়ে থাকে। ভৌমিক চোখ নামিয়ে নিজেই দূরে সরে যায়।

ভুখন এদিক আয় দেখি।'

খানিকের জন্য বনলতার পত্রের কথা ভুলে যেতে বাধ্য হয় ভৌমিক।

'জ্বর গায়ে যে এসেছিস? বদলি দিতে বলিনি?'

'সরকার মা বাপ।' কেউ নাকি রাজী হয় না।

'না এলেও কি আমি তোকে গর-হাজির দেখাতাম? মরবি শালা মর।'

'সরকার মা বাপ—হপ্তা আজ, আজ শনিচর (শনিবার)।'

'শালা চোর।' একটু হাসে সত্যবন্ধু। 'দে দে, দুটো বস্তা বিছিয়ে দে এইখানাটায়—এই ষ্ট্যাগটার পাশে।'

এবার বনলতা সোম আরও একটু ফিকে হয়ে আসে—অর্দ্ধরাত্রে যেমন নববধূর টিপটি ফিকে হয়ে যায়।

হপ্তা।

জ্বর গায় ত্রিশ টাকা মাইনের ভুখনই শুধু আসে না। একবার ব্রঙ্কাইটিস্ নিয়ে আসতে হয়েছে সত্যবন্ধুকেও। বনলতার সবে চাকরী হয়েছে, হাতে টাকা নেই, তাকে কিছু ধার দিতে হবে। চাক-ভাঙা টাটকা মধুর চাইতেও বোধ হয় বেশি আকর্ষণ এই হপ্তার। কুলি, বাবু-ছুটি, দারওয়ান, ড্রাইভার, এমন কি ম্যানেজার সকলেই উন্মুখ হয়ে থাকে সপ্তাহের শেষ দিনটির জন্য। এটি প্রিয় দিন। প্রিয়া হলে হয়ত রক্ষা ছিল না।

সুখের কথা এটা বিংশ শতক—সনাতনী শাস্ত্রের নিতান্ত একটি অপাংক্তেয় দিন, অবিস্মরণীয় হয়েছে মার্চেণ্ট প্রভু এবং বিদেশী মনিবদের অপার করুণায়। আজ অর্দ্ধ দিবস, কাল পূর্ণ দিবস ছুটি। পূর্ণের চেয়ে অর্দ্ধেকের আনন্দ যেন বেশি। যেন ছুটি হাত এক হওয়ার পূর্বের শুভদৃষ্টির সময়টুকু। র‍্যাঙ্ক এবং গ্রেড অনুসারে কেউ যায় 'বারে,' কেউ রেসকোর্সের মাঠে, কেউ বা ভাটিখানায়। অবশ্য ভুখনের কথা স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র এই গুদামের গোলাম কটার।

হপ্তা! মাস মাইনেতে পেট ভরা তো দূরের কথা, এ বাজারে জল গরমও হয় না। তাই সবাই এক জোট হয়ে কিছু ভৌতিক ক্রীড়া করে, যার ফলে শনিবারটি রৌপ্যময় হয়ে ওঠে। সে এক অদ্ভূত ক্রীড়া! সত্যবন্ধু থাকে যেন নিস্পৃহ। তবু নিমন্ত্রণের ডাকে তার জোটে পলান্ন। ভুখন ক্ষুধাতুর দৃষ্টি মেলে থাকে। উপায় নেই। এই হচ্ছে এখানের আইন। কোন্ স্বনামধন্য পূর্ব পুরুষ যেন বহাল করে গেছে। সত্য ভোগ করছে।

প্রথম প্রথম সত্যবন্ধুর ঘৃণা হত। শেষে দেখল যে, এদের সংগে সহযোগিতা না করলে বিপদ—কিছুতেই চাকরী রাখা যাবে না। উলটে জেলখাটাও আশ্চর্য নয়। এরা মরিয়া।

ভুখনকে বিদায় দিয়ে সত্যবন্ধু চিঠিখানা খোলে। তার মনটা একবার রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বর্ষা নেই, মেঘ নেই তবু তার উৎসুক চিত্ত যেন পেখম মেলে এই দাবদগ্ধ পরিবেশকে উত্তোরণ করে।

হঠাৎ এক ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ে। কটি লেখা মুছে যায়। ব্যাকুল হয়ে ওঠে সত্য। সংগে সংগে নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মে! শত ধিক তাকে! শত ধিক এ গোলামী। আবার একটি ভাঁজ খোলে সত্যবন্ধু।

কি সুন্দর স্বাক্ষরটি—বনলতা সোম! 'তোমার' কথাটি নেই—তবু ভৌমিকের কত পরিচিত। শিক্ষা দীক্ষায়ও ওদের অভাবনীয় মিল। দুজনে একই কলেজে পড়েছে, গ্র্যাজুয়েটও হয়েছে একই সময়। এতদিন বনলতা বেকার ছিল—এখন তো সে অন্তরায়ও ঘুচেছে।

চিঠিখানা একেবারে সংক্ষিপ্ত না হলেও সংক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। তাই ভৌমিক চট করে পড়ে না। ফুরিয়ে যাওয়ার আগে উপভোগ করে নানা কথা ওদের পরিচিত জীবনের আদ্যোপান্ত। নাটক নয় যেন কবিতা!

আবার ঘাম ঝরে ধূলো উড়ে আসে—ভৌমিক সাবধানে বাঁচিয়ে রাখে চিঠিখানা।

বনলতা! সত্যবন্ধু! কিন্তু সত্যকারের বন্ধু তো সে হতে পারে নি শেষ পর্যন্ত! তা হলে সে কিছুতেই ওকে অত দূরে যেতে দিত না। যত কিছু অন্তরায় এই সোয়া'শ টাকা মাত্র। কিন্তু সত্যবন্ধুর স্থায়ী উপসর্গ আছে একটি দূর সম্পর্কের আত্মীয়। অন্ধ, দেশে থাকেন।

বড়া সাহেব!' ভুখন এগিয়ে আসে।

ম্যানেজার সত্যবন্ধু লাফিয়ে ওঠে।

'কোন্ দিকে ?'

'ওধার মে!'

সত্য স্যার স্যার করতে করতে এগিয়ে যায়। যেন ওর উচিত ছিল অন্তর্যামী হয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা। তোয়াজ তোয়াজে বুঝি কার্পণ্য হয়ে গেছে সত্যবন্ধুর।

সাহেব ঠিক বড়া নয়—বড় কর্তার শ্যালক, খোদ মালিকের। ফোঁটা তিলকে ভারতীয়, বহির্বাসে সাগর-ডিঙান। শাল এবং তাল গাছের মত ঢ্যাঙা নয়, বিলিতি পিপার মত গোল। যেমন চর্বি, তেমনি মেজাজ।

'ফাইল কই? চুনের বস্তার ফাইল?' বড় সাহেব জিজ্ঞাসা করে। এক কালের মেধাবী ছাত্র যেন ভুলে যায়। কোথায় চুনের এবং নুনের বস্তার হিসেব তা যেন মনে পড়ে না।

কেরাণীও দুটি বোকার মত চেয়ে থাকে।

এখনও বোধ হয় সত্যবন্ধু তর্কশাস্ত্রের কঠিন প্রতিপাদ্যকে অতি প্রাঞ্জল করে পরিবেশন করতে পারে, হয়ত প্রয়োজন হলে ম্যাট্রিকের ভূগোলের একটা জটিল প্রশ্নেরও অক্লেশে উত্তর দিতে পারে—কিন্তু সে স্মরণ করতে পারছে না সামান্য চুনের বস্তার ফাইলটা কোথায় রয়েছে।

তার কান দুটো মলা না হলেও ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে।

সমস্ত গুদামটার ইজ্জৎ বাঁচায় ভুখন। 'লিজিয়ে সরকার।' সুমুখের থাক থেকে একটা ফাইল সে টেনে আনে।

বড়া সাহেব খুশি হয়। একজন সামান্য কুলি এত ওস্তাদ! সে ভিজিট বুকে লিখে য়ায় আধ পাতা। সত্যবন্ধুর কথাও লিখতে ভুলে যায় না। প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমন ম্যানেজার নইলে এমন কুলি! সত্যবন্ধু এবং ভুখন জানে যে, ওরা কখনও বড়া সাহেব হবে না, তবু হাসে—দেঁতো হাসি।

সত্যবন্ধু বড়া সাহেবের সংগে সংগে যায়।

কেরাণী দুটো একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কারণ তাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি খাতায়। ফিরে এলে তারা জিজ্ঞাসা করে, 'কত দিলেন?'

'যা বাঁধা রেট—প্রতি হপ্তা পঞ্চাশ।'

'না, না এবার থেকে আর আমরা তা দেব না।'

'তা হলে বরখাস্তের জন্য বহাল হয়ে থাকুন।'

সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ডের মত ওদের বিদ্রোহ মিলিয়ে যায়।

সত্যবন্ধু আবার নিভৃত কোণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার উচিত ছিল আগেই চিঠিখানা পড়ে ফেলা। ওখানা পড়তে কতক্ষণ আর লাগত। কিন্তু এতো অত্যন্ত জরুরী কোন ব্যবসা সংক্রান্ত তাগাদার চিঠি নয়। যেটুকুই রয়েছে, আছে বনলতার ব্যাকুলতা। হয় উগ্র, নয়ত সংযত। এ যে তিলে তিলে, পলে পলে উপভোগ্য।

সত্যবন্ধু সুন্দর, অতি সুন্দর সুপুরুষ—আর বনলতা কালো একটি মেয়ে। কিন্তু কি যে অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল তার দুটি চোখে! কথায় তীক্ষ্ণ দ্যুতির বিচ্ছুরণ। একদিন সে যখন কলেজের ডিবেটে মার্কস নিয়ে আলোচনা করল নিতান্ত দক্ষিণপন্থী প্রফেসার যতীনবাবুও হাততালি না দিয়ে থাকতে পারলেন না।

'কি হল স্যার?' জিজ্ঞাসা করেছিল ভৌমিক।

'না, মেয়েটা পড়েছে! তোমরা তো কিছু পড়বে না। তোমরা তো কেবল শিখেছ ডেপোমি।

যতীনবাবুর এ ভাবান্তর দেখে সত্যবন্ধুর ভিতরে ঈর্ষা জন্মেছিল। সে তারপর গোপনে গোপনে পড়েছিল মার্কস। বনলতাকে শুধু বিরুদ্ধ যুক্তির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করতে। কিন্তু সুযোগ তো চাই! বাড়ি এলেই আর গায়ে পড়ে ঝগড়া করা যায় না। অন্তত সে বয়সটা সত্যবন্ধু কাটিয়েছে। তবু কৈশোরের অমার্জিত হিংসা, দ্বেষে তাকে অস্থির করে রাখে। সে আদিমতা কাটিয়ে উঠতে পারে না।

একটি দুটি, তিনটি করে সপ্তাহ গড়িয়ে যায়। দেখা হয় বনলতার সংগে। চা খাওয়া, প্রচুর হাসি ঠাট্টাও হয়, কিন্তু ভিতরের জ্বালা কমে না সত্যবন্ধুর। সে জ্বালার দাহন তীব্রতম হয়, যখন ছেলেমেয়ে সবাই মিলে ওর মানে, বনলতা সোমের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে কথা শোনে। ঐ ছিপছিপে কালো মেয়েটির এমন কি ঐশ্বর্য

আছে তা সত্যবন্ধু বুঝেও বুঝতে চায় না। মানুষের, বিশেষ করে স্ত্রীলোকের রূপ নইলে কি বার আনা ফাঁকা নয়?

বনলতার বার আনা নয়, ষোল আনাই সত্যের মতে ফাঁকিবাজী। এমন কি ওর শাদা ধবধবে ঐ নিয়মিত ড্রেসটা পর্যন্ত? সজ্জার সৌষ্ঠবে কি কালো মেয়ে আলো করতে পারে সভা? বিশ্লেষণ করে দেখ, ও নিতান্তই কুৎসিত। ব্যতিক্রম মাত্র দাঁত কটি।

বনলতার পরিবেশ ছাড়িয়ে সে একটা পার্কে এসে ঢোকে। কালো মেয়ে তাকে ছাড়ে না। চলে হাওয়ার সংগে মিশে সত্যবন্ধুর পিছে পিছে। সারাদিন ভৌমিক মাঠে ঘাটে সিনেমায় ঘোরে কলেজে কামাই দিয়ে। বনলতা ওকে অনুসরণ করে।

অনুরণন ওঠে তার সমস্ত রক্ত বিন্দুতে।

তবু সত্যবন্ধু কিছুতেই স্বীকৃতি দিতে পারে না বনলতাকে।

ভৌমিক চিঠিখানার ওপর আলগা আলগা চোখ বুলিয়ে যায়। এ যেন মৃদু স্পর্শ, আলিংগন নয়।

তারপর একদিন আবার ডিবেটের সুযোগ আসে।

ভৌমিক প্রস্তুত হয়ে যায়। চতুর্দিকের বেঞ্চগুলো পরিপূর্ণ। শত শত চোখ। বনলতা ইস্পাতের মত ঋজুতা নিয়ে প্রবেশ করে। অমনি গুঞ্জন ওঠে। প্রতিযোগিতা উপভোগ করা নয়—সাদর অভিনন্দন,—আন্তরিক শুভেচ্ছা। বিষয়বস্তু সেই একই দর্শন। মার্কস। যারা মূক না হয়েও সভা সমিতিতে মূক, ভাষা যাদের তীব্র যুক্তিতে বাঙ্‌ময় হয়ে ওঠে না, তারা, তাদের মনের কামনা বন্যার জোয়ারের মত বের করে দিতে চায় বনলতার কণ্ঠ দিয়ে। বহুর একক রূপ যেন বনলতা সোম।

প্রফেসার যতীনবাবু কেবল একাই উৎসাহিত করেন সত্যবন্ধুকে

গোপনে 'আজ কুরুক্ষেত্রে সত্য নির্ধারিত হবে। চিয়ার আপ ভৌমিক। তুমি নিজেই তো সত্য! ভয় কি?' সেদিনের সেই স্মৃতি স্মরণ হলে আজও গায়ে কাঁটা দেয় ভৌমিকের। উভয় শিবিরের সত্যাসত্য আজ নির্ধারিত হবে।

ভৌমিকই প্রথম বক্তা।

বলেও সে প্রথম। সমস্ত শক্তি ও অধ্যয়ন সে সুতীক্ষ্ণ আয়ুধের মত ব্যবহার করে।

কিন্তু অধ্যাপকের ছাড়া একটি করতালিও সে পায় না। সে মুখ চোখ লাল করে বসে পড়ে বেঞ্চে।

বনলতা যা বলে, তা তার কেবলমাত্র তর্কের খাতিরে বলা নয়। তাই তার বক্তব্য যুক্তি ও তর্কের জাল ছিঁড়ে মানুষের উপলব্ধিতে গিয়ে ঘা দেয়। মানবতা বোধে বিবেক এবং চেতনাকে বিচলিত করে মুহুর্মুহু।

অজস্র করতালি ও উচ্ছ্বাসের ভিতর শেষ হয় বনলতার বক্তব্য।

ভৌমিক বেরিয়ে যায়।

আবার দমাদম মাল এসে পড়ে। চুন অথবা অমনি কোনও চূর্ণ। ধুলো এবার মেঘের আকার ধারণ করে। জলহীন বিশুষ্ক অনুপরমাণুর শুধু অস্তিত্ব। নাকে রুমাল চেপে সত্যবন্ধুকে গুদামের বাইরে বেরিয়ে যেতে হয়।

কোথায় যাবে? নিকটে যদি একটা চায়ের দোকানও থাকত! অগত্যা সে বারান্দায় দাঁড়িয়েই নিশ্বাস চেপে থাকে। কিন্তু কতক্ষণ তা চাপা যায়? এবার বোধহয় সহরের যাবতীয় দূষিত বীজাণু সে ভিতরে টেনে নেয়। তার কাশি আসছে।

চিঠির সুগন্ধটুকু যেন ম্রিয়মান হয়ে থাকে।

তবু বনলতা স্নেহ লতার স্মৃতির মত ভৌমিককে উতলা করে।

ডিবেটের কয়েকদিন বাদেই আবার দেখা লেকের প্রান্ত সীমায়। দ্রুত হে'টে চলেছে, ভৌমিক পিছন থেকে ডাকলে 'বনলতা!'

'কে?'

'ভৌমিক।' সত্য জিজ্ঞাসা করে চিনতে পারছ না?'

একটু তাড়াতাড়ি আছে, যা বলার তা বল। তোমাদের আমরা চিনতে পারব না এ ভুল কথা। চিনতে পারছি বলেই দুনিয়ার সর্বত্র মুখোস খুলে পড়ছে।'

'বনলতা আমাকে ক্ষমা কর। সেদিন যা বলেছি তা আমার তার্কিক মনের কথা, হৃদয়ের কথা নয়। তুমি শুধু আমার ভুল ভাঙনি, ধুয়ে মুছে পবিত্র করে দিয়েছে আমার হৃদয়। ক্ষমা কর বনলতা।

আসন্ন সন্ধ্যায় বনলতা শপথ করিয়ে নিয়েছে যে পাশ করে তার জীবিকার জন্য যাই করুক; কিন্তু জীবনবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে কোনও কর্মকেই অবহেলা করবে না। সারাদিনের ঘর্মাক্ত পরিশ্রমের পর অন্তত কয়েকটি ঘণ্টাও তারা ব্যয় করবে কোন সংঘের সংগঠনে। 'জীবন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল ভৌমিক এখনও যদি আমরা তর্ক নিয়ে বসে থাকি!' ইস্পাতের মত মেয়ের কণ্ঠ নরম হয়ে এসেছিল সেদিন। ভৌমিক মনে প্রাণেই শপথ করেছিল, বনলতা তোমার এবং আমার ধর্ম এক—আজ থেকে অভিন্ন।

বনলতা হেড মিস্ট্রেস হয়ে গেছে কোন এক চা-বাগানের সন্নিহিত স্থানে। সে নিশ্চয় তার প্রতিশ্রুতি পালন করছে, কিন্তু ভৌমিক? ভুখনের সঙ্গেও তারতম্য বজায় রেখে চলেছে অসৎ উপার্জনে। একটা দংশন অনুভব করে ভৌমিক মগজে।

ধূলোর মেঘ কেটে গেছে। শরতের স্বচ্ছ আকাশের মত না হলেও

নির্মেঘ হয়েছে গুদামের ভিতরটা। সত্যবন্ধু ঢুকতে যাবে, হন্তদন্ত হয়ে ভুখন ছুটে আসে। 'সরকার 'পাচার' হচ্ছে!'

সত্যবন্ধুর অজ্ঞাতে তার হাত পা কাঁপতে থাকে। দান্তে, হোমার, কালিদাস পড়া ছেলে কেমন যেন সংজ্ঞা হারাবার জোগাড় হয়। নিজেকে যেন সামলান অসম্ভব। টপাটপ করে ঘাম ঝরতে থাকে কপাল দিয়ে। সে যেন সহ্য করতে পারছে না এ জ্বালা। অথচ প্রকাশও করতে পারছে না কিছু। এমন তার প্রত্যহ হয় ঐ কথাটি শুনলে।

কোনও বিশ্ববিখ্যাত রাজনৈতিক কর্মীর কিংবা শিল্পীর মতবাদ অথবা শিল্প প্রচার নয়, এ একেবারে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর নিচের ধাপের বেঁচে থাকার সকরুণ কাহিনী—আইন গ্রাহ্য সর্বগ্রাসী লুণ্ঠন নয়, সামান্য একটু চুরি।

'কি পুলিশ-টুলিশ নেই তো?'

'না সরকার—মৎ ঘাবড়াইয়ে।' ভুখন সাহস দিতে থাকে—ও তো হামেশাই সর্বত্র হচ্ছে। ভয় কি!

সত্যবন্ধু একটু জল চায়। তার স্নায়ুগুলি যেন শুকিয়ে গেছে।

সরকারকে সামান্য জল খেতে দেবে কেন ভুখন, বিশেষ করে আজ 'হপ্তার' দিন।

সত্যবন্ধু পায়চারি করে না তো, ঘর্মাক্ত, পরিশ্রান্ত ঘোড়ার মত টহল দেয়। বারান্দা থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যতদূর দেখা যায় সে দৃষ্টি প্রসারিত করে থাকে। সে এখানে ওখানে কেবল পুলিশের মরিচীকা দেখতে পায়। আকাশের গায়ও যেন ওরা লুকিয়ে ওৎ পেতে রয়েছে। সত্যবন্ধু ঘাম মোছে। আবার ঘাম ছোটে।

ভুখন ডাবের বদলে বজ্রাঘাত তুল্য সংবাদ নিয়ে আসে। তার

জ্বরতপ্ত মুখ পাংশু। পুলিশ! ঠেলা বোঁঝাই 'পাচারের' সামগ্রী নাকি ধরে ফেলেছে।

সত্যবন্ধু দ্রুত গুদামে ঢুকে হাঁজিরার বইটা টেনে নেয়। সকলের জন্য না পারলেও, মাত্র যার জন্য সম্ভব, যে সকলের চেয়ে রোগে রোজগারে দুর্বল তাকে অনুপস্থিত লেখে। বুকপকেট থেকে কিছু টাকা বের করে শেষ ম্যানেজারী চালে সম্ভাষণ করে, 'ভাগ শালা এখান থেকে।'

ভুখনের সঙ্গে সঙ্গে ভৌমিকও সকলকে সংকেত করে বেরিয়ে যায়। একেবারে স্টেশনে গিয়ে ওঠে। বনলতার ঠিকানা জানে না? টিকিট কাটবে—তার চিঠি? নেই তো! তবু সত্যবন্ধু আন্দাজে টিকিট কাটে। বনলতাকে তার খুঁজে বের করতেই হবে। বনলতা তার জীবনের পক্ষে আজ একান্ত অপরিহার্য।

॥ সূর্যমুখীর মৃত্যু ॥

সহর থমথম…

নিস্তব্ধ দুপুর—

মেয়ে-হোষ্টেলের ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে সূর্যমুখী যেন জলছে। সবুজ হাল্‌কা শাড়ির আড়ালে নবনী কোমল লাবণ্যে বুঝি বা আগুন লেগেছে।

সূর্যমুখী জলছে। শিখা নেই, দিবা-স্বপ্নে বিভোর হয়ে যেন গনগন করেছে!

হার মানিয়ে দিয়েছে সে এই দগ্ধ দুপুরকে, হার মানিয়ে দিয়েছে সুমুখের রাস্তার পিচ-গলা জালাকে।

পথের ও-পারের মুখোমুখি পুরুষদের বোডিংয়ের আলো-ঝলকান কাঁচের জানালাও ম্রিয়মান। সূর্যমুখীর কাছে যেন হার মেনেছে তীক্ষ্ণ দ্যুতির প্রতিযোগিতায়।

সূর্যমুখীর পরিচয় সে ফুল নয়, শুধু একটি মেয়ে।

কিন্তু একটি মেয়ে মাতাল করেছে যেন জনহীন, পান্থহীন সহরের দাব-দগ্ধ প্রৌঢ় মধ্যাহ্নকে। তাই ঝিমিয়ে পড়েছে দুপুর।

সূর্যমুখী ষোড়শী নয়, অষ্টাদশী নয় কবি কল্পনার—সূর্যমুখীর বয়স হয়েছে—প্রায় চব্বিশ। সে রক্ত-মাংসের মানুষ। কলেজে সে যায়, কবিতাও সে পড়ে বটে, কিন্তু যখন-তখন নয়, এই ঠিক পরীক্ষার আগে-আগে। তাই তার আবেদন কাব্যধর্মী ধোঁয়াটে নয়—অতি বাস্তব, প্রাঞ্জল এবং সাবলীল।

কারুকে সে মুখ খুলে আজ পর্যন্ত কিছু নিবেদন করেনি, চোখে তার

ভাবাবেগের জল দেখেনি কেউ কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে। অনেক পথ-ভোলা প্রজাপতি এই সহরে সতর্কতা এড়িয়েও ওর দেয়ালে-দেয়ালে আবদ্ধ, ঘরে ঢুকেছে। মাথা কুটে মরেছে কোণায় এবং কার্নিশে। তবু সূর্যমুখী হাত বাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করেনি। সে যথানিয়মে মুখ ডুবিয়ে রেখেছে বইয়ের পাতায়। প্রজাপতি উড়ে চলে গেছে নিঃসংগ আকাশে অবহেলায়। রঙিন প্রজাপতি, সাত রঙে রাঙা যার পাখা, ছন্দ যার ছড়িয়ে আছে শরীরের রেণু-পরমাণুতে।

কত বর্ষা এসেছে, তৃষ্ণার্ত সহরে ঢেলেছে সুমংগল ধারা। ছাদের কার্নিশ বেয়ে জল পড়েছে জালানায়। সূর্যমুখী ছিটকানী খোলেনি। এলান অলকদামে, উলংগ গণ্ডে ও কণ্ঠে লাগায়নি কখনও সিক্ত হাওয়া, রেণু-রেণু জল,—পাছে তার টনসিল ফোলে!

সে তখন আলো জেলে বদ্ধ ঘরে কষেছে দুরূহ অংক। নিরালায়, এই মেঘ-মন্দ্রিত বর্ষায় পাওয়া গেছে আশাতীত সুফল। সে গজমতির মত ক'টি দাঁত মেলে একটু হেসেছে। সে হাসি দেখেছে রূপকথার দেশের এক রাজপুত্র এবং দেয়ালের গায় লগ্ন একটা গিরগিটি। প্রথমটি ক্যালেণ্ডারের ছবি, দ্বিতীয়টি খেলনা। সাদৃশ্য নেই উভয়ের মধ্যে, কিন্তু অনুরাগ ছিল অত্যন্ত। নইলে হয়ত রাজপুত্র কেটে ফেলত গিরগিটিটাকে, কিম্বা গিরগিটিটা গিলে খেত শ্রীমান রাজপুত্রকে।

তেপান্তরের মাঠ ডিঙিয়ে, সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে রাজপুত্র এখানে আসেনি, এসেছে এক প্রসিদ্ধ রঙওয়ালার বিজ্ঞাপনের পেশাদার ঘোড়সওয়ার হয়ে—দাম বার আনা ন' পাই। আর কি ভাবে যেন গিরগিটিটা এসেছে মদ্রদেশীয় তরুণ এক ভাস্করের উপহারের নিদর্শন হয়ে এই কলকাতার বাঙালী মেয়ে-হোষ্টেলে এবং সেই অবধি রয়েছে সূর্যমুখীর দিকে হাঁ করে!

বর্ষা গেছে, শরৎ এসেছে, তারপর হেমন্ত, তারপর শীত। ঢিমিয়ে এসেছে দিন। হিমেল হাওয়ায় কনকন করছে সারা সহর। নেমেছে মাঘের দুঃসহ শীত। নিঃসংগ কুহেলী-ক্লান্ত রাত্রে শোনা যায় ছাদের চিলে-কোঠার ধারে যেন একটা মর্মভেদী করুণ বেহাগ।

'কে কাঁদে লো? কে কাঁদে?' সূর্যমুখী অস্ফুট স্বরে নেপথ্যে শুধায়ঃ 'কে গা তুমি?'

জবাব আসে, 'আমি বিরহিণী, হিমখিন্না ত্রিযামা যামিনী।'

চমকে উঠে সূর্যমুখী প্রিয় সখী অনসূয়ার মত। ইচ্ছা করে ঘুমের ঘোরে গলায় মাফলার ও গায়ের দামী র‍্যাপারখানা ছাদে গিয়ে দিয়ে আসতে। এখন তো তার ওগুলোর দরকার নেই মোটে, শিমূল তূলোর লেপেই সব তৃষ্ণা মিটছে!

সাহস হয় না সূর্যমুখীর একা-একা ছাদে গিয়ে দরদ দেখাতে— যদি হাত বাড়িয়ে তাকে হঠাৎ ভূতে ধরে!

কত ফাল্গুনের পৌর্ণমাসী এসেছে হোষ্টেলের ইমারতের খোলা ছাদে চাঁদের কবরী বেঁধে, গলায় দুলিয়ে তারার মালা, নভ-অংগনে ছড়িয়ে হীরা-মতি-পান্নার ফুল—আনন্দে অদূরে দুলছে যেন নগরীর বিলাসিনী নর্তকী হাওড়ার পুল, বিজলী-বাতির থালা নিয়ে।

মেয়েদের তখন নিষেধ ছিল একা-একা ছাদে উঠে আনমনে পায়চারী করতে। সেই নিষেধটা এখন বেশ রপ্ত হয়ে গেছে যান্ত্রিক অভ্যাসে। সেই সময়টা এখন ভাল লাগে দান্তে, কাণ্ট, হেগেল চিবুতে অথবা হিট, লাইট, মেটা-ফিজিক্সের মরফিয়ার ডোজ দিয়ে মস্তিষ্কটা একটু চাঙ্গা রাখতে।

রাস্তার ও-পারে পুরুষদের বোর্ডিংয়ের কোণার ঘরটিতে সূর্যমুখীর মুখোমুখি কে থাকে?

একজন প্রফেসর, না দার্শনিক ?

কবিও হতে পারে। আশ্চর্য নয় একজন এ্যাকাউন্‌টেণ্ট হওয়াও। জানালাটা এখন বন্ধ, খুলবে কখন তারও ঠিক নেই, নইলে মোটা মোটা বই-খাতাও দেখা যেত, আর বোধহয় প্রুফের লম্বা লম্বা অনেকগুলো সিট।

সব জড়িয়ে পৌঢ় ভদ্রলোক যেন একটা কমার্শিয়াল বাণ্ডিল !

মন্দ নয়, ওর মধ্যেই একটা আধুনিক ছন্দ আছে যন্ত্রের।

এর অধিক কিছু ওর সম্বন্ধে চিন্তা করেনি এতদিন সূর্যমুখী।

একটার পর একটা পরীক্ষা দিয়ে এগিয়ে গেছে ও, গত সপ্তাহে সীমানা অতিক্রম করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের।

এবার বিদায়ের পালা। এই পরিচিত কোঠা, ঐ পরিচিত জানালা, ওপরে-নীচে এপাশে-ওপাশে দালানে-দালানে খিলান টুকরা টুকরা এই আকাশের পরিবেশ তাকে ত্যাগ করে যেতে হবে।

যেতে হবে অনেক দূরে···সাগর পাড়ি দিয়ে···আরো অনেক পড়তে···

একটি নীবার-মঞ্জরীর মত থরথর করে সূর্যমুখী কাঁপছে—রক্ত-মাংসের নারী সে আজ ভাবছে : কেনই বা সে এল এখানে—কেনই বা তাকে আসতে হল ?

বিজ্ঞানের ছাত্রী সূর্যমুখী আজ নিজের জীবনটা ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিশ্লেষণ করে দেখছে, আর জ্বলছে যেন এই দারুণ দ্বিপ্রহরে।

অতীত তার মর্মান্তিক, ভবিষ্যৎ তার নিষ্প্রভ।···তাই কেন সে বর্তমানকে ত্যাগ করবে ?

ঐ রুদ্ধ বাতায়ন সন্ধ্যার পূর্বেও কি খুলবে না ?···

সূর্যমুখী অনূঢ়া নয়, ঠিক বিধবাও তাকে বলা চলে না। বৈধব্যের

কোনও সুমধুর স্মৃতি নেই, যা চয়ন করে মালা গেঁথে সে বাঁচতে পারে আজীবন।

দুর্ঘটনায় তার স্বামী মারা গেছে বিয়ের সভায় বসে। অসম্ভব নয়, খুবই সম্ভাব্য সত্য।

বাপ বড়লোক। পাঠিয়েছেন কলেজে পড়তে।

তারপর একে একে ছ'টা বছর গেছে। সে তিনটা পাশ করেছে। এখন বাপ তার পাঠাতে চাচ্ছেন বিলেত।

কেনই বা সে পড়বে? এত যে পড়েছে তাতেই বা তার কি লাভ হল? বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে সূক্ষ্ম দর্শন এসেছে, প্রশ্ন জেগেছে অপূর্ব, কি লাভ হল?

ওরে রক্ত-মাংসের নারী তোর যে সুমুখে কুজ্ঝটিকা—বর্তমানও যে ফুরিয়ে গেল!

জুড়িয়ে যাবে তপ্ত যৌবন, শিথিল হবে দেহের ছন্দ—বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্রীর আজ চোখে জল এল।

জ্বলন্ত পাবক কাঁদছে ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে—আর দ্বিপ্রহর গড়িয়ে যাচ্ছে সায়াহ্নের দিকে।

আরও ক'দিন সুমুখের বোর্ডিংয়ের ভদ্রলোকের সংগে দেখা হয়েছিল কোন্ লাইব্রেরীর লিফটে যেন।

দীর্ঘ সৌম্য মূর্তি, গভীর নয়ন, প্রশস্ত ললাট। শুধু কালো হয়েছে রঙ জীবন-যুদ্ধে!

একে কি না সূর্যমুখী একদিন ভেবেছিল কমার্শিয়াল বাণ্ডিল—মন্দ নয় এর যান্ত্রিক ছন্দ!

এ যে মনুষ্যরূপী অনঙ্গ। রতি মূর্ছা যেতে পারে এর পদতলে!

অবশ্য সূর্যমুখী প্রথম দিনটা শুধু একটু উর্ধ্বমুখী হয়েছিল সাগ্রহে বিস্ময়ে।

কোথা থেকে এল লিফটের এই আঁধার কোঠায় স্তিমিত সূর্য—সূর্যমুখী ফুলের জীবনবল্লভ!

আরও একদিন বাস থেকে নামছে যখন, হাত থেকে ওর পড়ে গেল বই—ফিজিক্স্‌খানাই, তুলে দিল ভদ্রলোক।

'ধন্যবাদ'—আর কিছু বলতে পারেনি সূর্যমুখী। তখন পরিবেশও নয় বেশি কিছু বলার। চলন্ত বাসে উঠে ভদ্রলোক চলে গেল, স্মিত মুখে।

এ তো ঠিক কমার্শিয়াল হাসি নয়, হাসি নয় গাণিতিক!

আজ মর্মে মর্মে বুঝেছে সূর্যমুখী বিজ্ঞানের বাইরেও আছে সুদূর প্রসারী অনাদি অনন্ত ইংগিত। ওর মনো-নভে সেই ইংগিতের ঝংকারই যেন বাজছে। তারায় তারায় কাঁপছে সুর, অনুরণিত হচ্ছে দৃশ্য-অদৃশ্য গ্রহে, ছায়াপথে।

তাই তো আগুন লেগেছে ওর সারা দেহে।

আজ ও একখানা তীব্র ইশারা পাঠাবে ঐ বাতায়ন পথে। সে ইশারা হবে ভাবের। ভাষা কখনই বহন করতে পারে না এর ভাব, ব্যক্ত করতে পারে না এর ব্যঞ্জনা কোন ধ্বনি। ও ভাবময়ী নারী হয়ে যাবে ঐ ইশারার অন্তরালে বসে।

কেউ ডাকল কি না ডাকল ও আজ সেদিকে চাইবে না, সাড়া দেবে, উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিয়ে না হয় নিঃশেষ হয়ে যাবে দিনান্তে। ও তো মানুষ নয়, ও যে সূর্যমুখী ফুল! ওর যে মন-কুসুমের দলগুলি ভোর না হতে মেলেছে পাখা, তা তো অন্ধকারে বন্ধ হয়ে যাবে—এই তো ওর ভাগ্য-লেখা। ও দুর্ভাগ্যকে বরণ করবে, কিন্তু কেউ ব্যাকুল হয়ে না ডাকলেও ও আজ সাড়া দিয়ে যাবে—শেষের সাড়া।

দ্বিপ্রহর গত হয়ে যায়।

আসে অপরাহ্ণ বিপরীত জানালায় বিষণ্ণ বিহ্বল।

বাস চলে, ট্রাম চলে, কোলাহল বাড়ে ফুটপাথে।

অশ্ব-হ্রেষা, শোনা যায় মোটরের হর্ণ···

ক্রমে সন্ধ্যা আসে, বিয়োগ-বিধুরা নয়—আশ্চর্য এক সুসজ্জিতা সহরের বারবিলাসিনী। সহস্র সহস্র বিজলীর বাতি জ্বলে তার গতিপথে, মুখর ভক্তের দল। বিপণীতে-বিপণীতে শোনা যায় কলরল অবিরাম। সিনেমায় বিজ্ঞপ্তি টাঙান 'ফুল হাউস'। হাস্যে-লাস্যে দুলে ওঠে সন্ধ্যার সহর।

ঝুল বারান্দায় শুধু সূর্যমুখী কাঁদে!

এমনি সময় ও-পারের বোর্ডিংয়ে কে যেন জিজ্ঞাসা করে, 'আজ যে এত দেরী রমেন বাবু?'

'হ্যাঁ ভাই, লাইব্রেরী থেকে ফিরতে আজ খুবই দেরী হয়ে গেছে।' রমেন বাবু নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। তাড়াতাড়ি খুলতে চেষ্টা করে জানালাটা। কিন্তু পারছে না। যৌবনের বাতায়ন বার্দ্ধক্যে এসে ঠেকেছে উদাসীনতায়। ছিট্‌কিনি নেই, দড়ি দিয়ে বাঁধা।

অনেক কষ্টে রমেন বাবু জানালা যখন খোলেন, হঠাৎ তখনি কি যেন সুমুখের ঝুল-বারান্দায় জ্বলে উঠে নিবে যায়।

একেবারে সহরের এই পথটা ফিউজ হয়ে গেছে আচমকা।

* * * * *

কিছুক্ষণ বাদে দেখা যায় বারবিলাসিনী সহরে সন্ধ্যা আবার জম-জম করছে! বাতি জ্বলছে সবগুলো।

রমেন বাবু দেখে: মেয়ে-হোষ্টেলের সুমুখে একখানা মোটর। তাতে বিদেশ যাওয়ার লট-বহর সাজান। একজন বৃদ্ধ অভিভাবক গোছের লোক যেন হুকুমের মত কাছে দাঁড়িয়ে।

॥ একটি স্মরণীয় রাত্রি ॥

রাস্তার তেমাথাটা সন্ধ্যাবেলা এমনি গমগম করে প্রত্যহ।

ফুলওয়ালা, ফেরীওয়ালা, ভিখারী অতিষ্ঠ করে তোলে একটু দাঁড়ালে। চলমান পথিকদের মাঝে মাঝে চমকে থামতে হয়—থেঁৎলে যায়নি তো কোনো জুতো-পালিশ ছোকরার হাতটা। এক এক সময় মোটরের হর্ণ, পেট্রোলের গন্ধ অসহ্য হয়ে ওঠে। কখনও কখনও কারুর স্নায়ুতন্ত্রীকে পীড়া দেয় কর্মক্লান্ত মানুষের এ প্রবাহ।

কিন্তু এর ভিতরই দু-একটি তন্বী এদিক ওদিক করে। কোনো গানের ইস্কুলের ছাত্রী একটি তানপুরা হাতে পাশ কাটিয়ে যায়। যেন অসম্ভব কষ্টে বহন করছে সম্ভ্রম। চকিতে কেউ লজ্জারুণ হয়ে ওঠে। কেউ বা হেড মিষ্ট্রেস, শান্ত-গম্ভীর পদক্ষেপ। কারুর বা তৃষিত দৃষ্টি।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়িয়ে অমিয় রোজ এখানে এসে দাঁড়ায়। সিগারেটের পর সিগারেট চলে। অফিস-ফেরৎ যাবে কোন্ চুলোয়! সন্ধ্যেবেলায়ই আর ফ্ল্যাটে ঢুকে বসে থাকতে ভাল লাগে না। দেশেও কেউ নেই যে চিঠি লিখবে। একটা অন্তত ছোট ভাই-বোন থাকলেও উপদেশ বর্ষণ করা যেত। দায়িত্বের চাপে আনন্দ পেত খানিক।

সিনেমা?

আর কত দেখা যায়!

ব্যাড্‌মিণ্টন, ক্লাব, ফ্ল্যাশ?

তা-ও কি বাকি রেখেছে? একেবারে হয়রান হয়ে গেছে সে। এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করতে চায় একটু। শুধু বিশ্রাম বললে ভুল করা হবে। মস্তিষ্কের অমানুষিক পরিশ্রমের পর, যেমন মানুষ চায়

নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে একটু বুঁদ হয়ে থাকতে। ঘুম নয়, তন্দ্রা নয়—এ যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি! দারিদ্র্য নয়, বিলাসই বলব।

কিন্তু এখানে কেন ?

সে উত্তর অমিয় নিজেই জানে না।

কিসের অভাব অমিয়র ?

চাকরীর ? সে তো নামকরা এক ফার্মের কেরাণী। মাইনে যা পায় এবং অন্য ভাবে একান্ত খুশি হয়ে যা তার পকেটে গুঁজে দেয় তা মোটেই তুচ্ছের নয়। হিসেবী হলে একটি অতি-আধুনিক মেয়েরও নখের ডগা থেকে ঠোঁটের কার্নিশ পর্যন্ত রঙ চড়িয়ে কিছুটা জমান যেত।

বিনয় প্রায়ই বলে, তুই আর দেরি করিস নে, এক জায়গায় কথা দে। বলিস তো সুনন্দাকে চিঠি লিখে দি আজই। সেই যে দেখা হয়েছিল গিরিডিতে। মাষ্টারী করে পাহাড়ী রাজ্যে, নিশ্চয় এখনো কেউ জোটেনি। মাইরি কি চমৎকার প্রফাইলটা দেখেছিলাম সন্ধ্যেবেলা··· তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খানিক দৈহিক উদ্বেগ প্রকাশ করে। কি করব আমার হাত-পা বাঁধা, নইলে···।

অমিয় কোনো জবাব দেয় না। একটু একটু হাসে।

ভাবছিল চাকরীটা এখনো পারমানেণ্ট হয়নি ? ওরে বোকা, জীবনটাই যে টেম্পোরারী, যৌবনটা আরো। তুই যে হাঁ করে রয়েছিস ?

অমিয়র সারা মুখে একটা খুশির রক্তাভা ছড়িয়ে পড়ে। সে মুখ ফুটে কিছু উত্তর দিতে পারে না।

আমরা সংসারী হলাম কি করে ? তোরই তো 'কলিগ্'। যখন নোটিশ হবে আমরা কি বাদ যাব ? তবু দেখিস উপোস করে মরব না। ব্রাদার, ভয় নেই, ঝুলে পড়। যৌবনটা কিন্তু আরো···

দূর, দূর, তুই চুপ কর এখন।

তোর বাপ নেই, মা নেই। অভিভাবক বলতে আমরা—বললেই চুপ করব? আজ-কাল না কি মাঝে মাঝে রেসেও যাস্? দেখ, দেখ, সুনন্দা দেবীর মতই যেন একখানা প্রফাইল এদিকে এগিয়ে আসছে। ডাকব না কি?

বাবু মালা চাই?

কার গলায় পরাবে ও? বিস্তি মিলছে না। সাহেব আছে, গোলাম না হয় আমিই হলাম, বিবি একটি আজ পর্যন্তও জুটছে না! সন্ধান দিতে পার, নইলে মানে মানে সরে পড়ো বাপ ধন!

ফুলওয়ালার মুখ চুন হয়ে যায়। তবু সে বলে, সত্যি নেবেন না? দেখুন কেমন চমৎকার গন্ধ—শীতের রজনীগন্ধা, এখন পর্যন্ত বাবু বৌনি হয়নি। আপনাদের মত বাবুরা যদি···কাল পাঁচ টাকার ফুল নষ্ট হয়েছে।

আর লাখ টাকার জীবনটাই যে খাবি খাচ্ছে। কেউ বৌনি করলে না! ওঁর অবশ্যি একটু দোষ আছে। টেম্পোরারীর ভয়ে নিজেই এগুলেন না। বড্ড লাজুকলতা। তোমার মত নয় হে!

বিনয়, থাম, থাম! একটা অপরিচিত ফুলওয়ালাকেও তুই রেহাই দিবি নে? এক ছড়া মালার দাম কত হে?

ছ' আনা।

দাও, দিয়ে সরে পড়ো—নইলে আরও নাস্তানাবুদ হবে।

ফুলওয়ালা চলে যায়।

সত্যই সুনন্দার প্রফাইলখানা এগিয়ে আসছিল। কিন্তু কোথায় যেন মিলিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

সুনন্দা নয়, কিন্তু অনেকটা তার মতই দেখতে। তেমনি যেন নাক

চোখ। তেমনি যেন গায়ের গড়ন। শুধু মুখের ও চোখের অতৃপ্তি আর একটু গাঢ়। বয়সটাও যেন বেড়েছে। তবু উজ্জ্বল আলোতে, শিফনের শাড়ির বেষ্টন ক্ষণিকের জন্য মাদকতা সৃষ্টি করেছিল।

অমিয় ভাবে, মানুষের এ প্রবাহ একটু বাদেই কমে যাবে। নিবে যাবে দোকান-পসারের বাতি। শুধু জ্বালা কমবে না তার হৃদয়ের। অব্যক্ত এ অনুভূতি তাকে দহন করছে তিলে তিলে।

ব্রাদার, তিলোত্তমা পাবে না—এখনও সময় আছে, চিঠি লিখে দি একখানা। এই নে, আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ভেবে দেখ। দেশলাইর কাঠি একটা জ্বালিয়ে বিনয় এগিয়ে যায়। তুই মদ ধরেছিস? তা হলে বুঝি আর কিছু বাকি নেই?

একটা আছে।

তার জন্যই বুঝি রোজ দাঁড়িয়ে থাকিস তেমাথায়? ছিঃ, ছিঃ, এত দূর অধঃপাতে গেছিস! আমি চললাম।

অমিয়র মুখের সিগারেটা জ্বলে না। কিন্তু ফুটপাতের ময়লা এক টুকরা কাগজ ঠিকই পুড়ে যায়।

সুনন্দার সংগে ওদের দেখা হয়েছিল একটা ছোট্ট পাহাড়ী পথের বাঁকে। বিনয় ও অমিয় চড়াই ভেঙে উপরে উঠছিল। সুনন্দা তার সংগিনীদের নিয়ে নামছিল নীচের দিকে। প্রথম শোনা গেল হাসি—পাথরে পাথরে ঠিকরে এগিয়ে এল শব্দতরংগ। ঝংকার অনুরণিত হল পাহাড়ী লতাগুল্ম শাল-পিয়ালে। তারপর যেন দেবকন্যাদের আবির্ভাব!

ক্যামেরাটা ঠিক করে নে অমিয়! হাঁদার মত আমার দিকে চেয়ে রয়েছিস যে? ভিউ ফাইণ্ডারে চোখ দে!

একটা শব্দ হয়—ট্রিক্।

থ্যাটস্ রাইট !

ওরা চোখ তুলে দেখে যে শিকার ক'টির মুখে রুমাল চাপা !

বিনয় এগিয়ে এসে বলে, একেবারে বোকা বানিয়ে দিলে রে ! চল, ফিয়ে যাই ! এবার হামলা করব রয়াল বেঙ্গল টাইগারের মত আচম্বিতে । তুই পারবি নে, আমাকে দে ।

দরকার হবে না ।

বললেই হল ! ট্রাই ট্রাই ট্রাই এগেন। তোকে নিয়ে যে কি মুস্কিলে পড়েছি !

এক্সপোজার করেক্ট হয়েছে ।

তাই নাকি ? বুঝিয়ে বলতে হয় ব্রাদার ! হিফ্ হিফ্ হুররে ! জয় হিন্দ ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ ! তা হলে আর চড়াই ভেঙে কসরৎ করে কাজ নেই। এদের মধ্যেই একটিকে বাগিয়ে ফেলতে হবে । কোন্‌টি পছন্দ হয় তোমার ?

আমি তো কারুকেই ভাল করে দেখিনি ।

এই মাটি করেছে !

সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে ওঠে পাহাড়ী রাজ্যে। ওরা ফিরে আসে তাড়াতাড়ি হেঁটে এসেও কারুকে দেখে না। সুনন্দাদের দলটি ভিন্ন একটা সোজা পথ ধরে নেমে এসেছে। ওরা এ পথটা চেনে না। বিনয় অমিয়কে নিয়ে ছুটোছুটি করে আসে ।

হাসি শোনা যায় অদূরে। তারপর মোটরের শব্দ। হেড লাইটে পথের দু'ধারের গাছপালা দীর্ঘ ছায়া ফেলে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে থাকে ।

বিনয় বলে, সেম্ সেম্—পালিয়ে গেল শেষটায় ! তুই, মানে ইউ, ডোণ্ট মাইণ্ড, আমি ঝাঁক শুদ্ধু ধরে দেব রাজহংসী—আজই, এই নৈশ

পরিবেশে। রোমান্টিক অ্যাটমোস্‌ফেয়ারে। ব্রাদার, একটা গোল্ডফ্লেক এ্যাডভান্স কর তো।

পারবি?

নিশ্চয়।

তবে এই নে।

ওরা দুজনে একটা মোটর ভাড়া করে। পথে কোনো কথা হয় না—যেন দম বন্ধ করে সময় কাটায়। বাংলোতে ফিরে এসে ড্রাইভারকে ভাড়া চুকিয়ে দেয় অমিয়।

কুছ বকশিস্‌ সাহেব!

অমিয় আবার পকেটে হাত দেয়। বিনয় ওর হাত চেপে ধরে। আজ নয় পাঁইজি, কাল সক্কালে এস। ডবল পাবে। আজ শিকার ভগ গয়া।

কি যে তোর ফাজলামি! ও ভাবলে কি বল তো?

যা-ই ভাবুক, তোর তার জন্য মাথা ঘামাতে হবে না। তুই গিয়ে বয়টাকে ডেকে চা তৈরী করতে বল। বাথরুম থেকে আমি এলাম বলে।

প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে যায়, বিনয়ের দেখা নেই। অমিয় ধড়াচূড়া ছেড়ে পূর্ণ ঘরোয়া হয়ে বসেছে। চা এল—একটু ইতস্তত করে চা-ও খেল সে। তার পেট জ্বলে যাচ্ছিল। একটা মাসিক পত্রিকাও উলটে পালটে দেখল খানিক। এবার রীতিমত চিন্তা হল অমিয়র। কোনো অ্যাকৃসিডেন্ট হল না কি? বাথরুমের এমন অনেক গল্প শুনেছে অমিয়। তবে ভরসার মধ্যে বিনয়টার হার্ট ট্রাবল নেই।

কি রে, এতক্ষণ ধরে কি করছিস?

একটা লাল আলো নিবিয়ে দিয়ে বিনয় বেরিয়ে এল। এর নাম বুঝি করেক্ট এক্সপোজার—সব ভোঁ ভোঁ ফোঁ ফোঁ। তুই একটা আস্ত গাধা।

কই দেখি। অমিয় স্থইস টিপে ধরে। কেন, ঐ যে একখানা মুখ দেখা যাচ্ছে প্লেটে।

মাইরি! আর দেখিস নে, আর দেখিস নে। নিবিয়ে ফেল আলো—ফর হেভেন্স সেক নিবিয়ে ফেল।

অমিয় স্থইসটা অফ করে দিয়ে মন্তব্য করে, তুই হচ্ছিস এক নম্বর আনাড়ী। ওয়াসিংয়ের ঠেলায় সব শেষ করে দিয়েছ নাকি কে জানে!

এর বিরুদ্ধে রীতিমত একটা থিসিস্ লেখা যেতে পারে। তুমি যে একটিকে বাদে আর ক'টিকে ফোকাসের ভিতর আনতে পারনি তার কি কোনও প্রমাণ আছে? তাহলে বন্ধু তুমিই বল না কে আনাড়ী?

সাধারণত অমিয় উঁচু পর্দায় গলা তুলে খুব কমই প্রতিবাদ করে। সে বলে, অফ কোর্স নট! আমি লোয়ার কোর্ট, আপার কোর্ট, দরকার হলে হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়তে রাজী—তেমন সট যদি নিতে পেরে থাকি, সেইটাই তো আমার কৃতিত্ব।

বিনয় বলে, ব্রেভো! হাতে হাত মিলাও বন্ধু! দেখছি আমারই হারা উচিত। কবুল করছি ভোর নাগাদ অন্তত একটি রাজহংসী ধরে দেবই দেব।

ঠিক ভোরবেলাই বিনয় পারে না তার প্রতিশ্রুতি পালন করতে। অপেক্ষা করতে হয় সূর্যালোকের জন্য। সে ছাড়াও তোড়জোড় রয়েছে যথেষ্ট। এই কিছুক্ষণ হয় ড্রাইভার এসেছে। মোটরটার কালো রঙ চকচক করে ওঠে প্রথমতম সূর্যের দীপ্তিতে।

এই নে অমিয়! ঠিক প্রিণ্ট উঠল না। বড্ড হেজি হয়ে গেছে। আসলে নেগেটিভটারই দোষ।

দেখি দেখি—কিন্তু অস্পষ্ট বলেই কি অত স্থন্দর দেখাচ্ছে?

অমিয়ের চোখে-মুখে মনে রঙ লাগে। সে মশগুল হয়ে থাকে। বিনয় ফটোখানা নিয়ে বেরিয়ে যায় মোটয় হাঁকিয়ে।

ফেরে ছুটোর পর।

এত সময় অমিয় কি করে যে কাটিয়েছে! জীবনে এমন নাটকীয় সংঘাত সে কখনো অনুভব করেনি। অথচ কিছুই নয়, অতি সামান্য একটা কাচের কালো প্লেট, তারই সংযোজনায় ঝাপসা একটা ছবি।

কিন্তু কেন মুখর করেছে হৃদিদিগন্ত ?

অমিয় এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, সংবাদ কি ?

ভাল নাম সুনন্দা মিত্র। এখানের এক ইস্কুলের হেড মিষ্ট্রেস। বয়স বছর বাইশ তেইশ।

এত খবর তুই কি করে নিয়ে এলি ? মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড তুই যে কি একটা চিজ! ভেড়ার শিংয়ে ঠেকিয়ে দিলেও ঠিক কেটে বেরিয়ে যাবি।

কিন্তু পারলাম কোথায় ? ওরা ভোরের এক্সপ্রেসে নাকি বেড়াতে গেছে। কবে ফেরে তা কেউ বলতে পারল না। এই নাম ধাম ঠিকানা। হয়তো ছুটি ফুরালে ফিরবে।

ও—! অমিয় আর কিছু বলে না।

মাসের পর মাস গত হয়ে যায়। পকেটের ছবিখানা কোথায় কি ভাবে পড়ে থাকে তার হদিশ অমিয় রাখতে পারে না। কিন্তু বুকের ছবিটা কিছুতেই যেন মিলিয়ে যেতে চায় না।

তা-ও ক্রমে ক্রমে আবছা হয়ে আসে রেসের মাঠে, ফ্লাশের আড্ডায়, নয়তো রঙিন মদের সফেন উর্মি স্তবকে।

বিনয় এইমাত্র চলে গেছে। সংগে সংগেই প্রশ্ন হল,—এই ঠিকানাটা বলে দিতে পারেন—?···

অমিয় সুনন্দার প্রফাইলখানাই যেন দেখতে পায় তার সুমুখে। ভ্রান্তি নয় ত? সে ভাল করে চোখের পলক ফেলে কয়েক বার।

আমি রাস্তাটা ঠিক খুঁজে পাচ্ছি নে। অনেক দিন বাদে এ অঞ্চলে আসছি, সব যেন পালটে গেছে।

হ্যাঁ তা বটে, চেনাই দায়।

মেয়েটি এক টুকরা কাগজ অমিয়র হাতে দেয়।

আসুন আমার সংগে।

কত দূর যেতে হবে?

বেশী দূর নয়।

আপনার তো অসুবিধা হবে না?

না, না, কিছু অসুবিধা নেই।

অমিয়র পিছু পিছু মেয়েটি এগিয়ে চলে। দুটো বড় রাস্তা পার হয়ে অমিয় একটা ছোট রাস্তার মোড় ঘোরে। অপেক্ষাকৃত অন্ধকার এ পথটা। নির্জনও বটে। মেয়েটি একটু যেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে। তবু এগিয়ে চলে অমিয়র সংগে। গোটা চারেক বড় বাড়ি ছাড়ায়। একটা কয়লার আড়ত্।

আর কত দূর? অনেকখানি তো এলাম।

অমিয় হাসে। একটু চেয়ে দেখে মেয়েটির সর্বাংগে।

নিজের দুর্বলতায় মেয়েটি যেন লজ্জিত হয়। সে দ্রুততর করে দেয় তার চলার গতি। কিছু দূর এগিয়ে আসতে না আসতে আবার সে পিছিয়ে পড়ে।

আপনি দেখছি পরিশ্রান্ত। একটা রিক্সা ডেকে দেব নাকি?

বলেন কি, এখনো রিক্সা ডাকতে হবে? মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ে মাঝপথে! ক্ষণিকের জন্য তার মনে একটা কেমন যেন সন্দেহ জাগ্রত হয়।

দূর বলে রিক্সা ভাড়া করতে চাইছি নে, চাইছি যে আপনার কষ্ট হচ্ছে।

হক—আর কত দূর বলুন তো?

ঐ যে, ঐ মোড়টা ছাড়িয়ে আর ক' কদম হাঁটলেই। শিবমন্দিরটার পাশ দিয়ে গলিটা উঠেছে দক্ষিণমুখি।

রাস্তায় লোকচলাচল পাতলা হয়ে গেছে। শীতের রাত্রি—দশটা তো বটেই। মেয়েটি চার দিকে তাকিয়ে একটু যেন দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

অমিয় সমস্ত বুঝতে পেরেও কিছু বলে না। সে হেঁটে চলে অনেকটা নিস্পৃহচিত্ত পরোপকারীর মত। কিন্তু সহস্র প্রশ্নে উদ্বেল হয়ে ওঠে তার অন্তর। এ মেয়েটি কে? কেন এসেছিল এখানে? স্থনন্দার সংগে ওর কি কোনও সম্পর্ক থাকা সম্ভব? অমিয় বিস্মৃতির অতল থেকে পুরান ঝাঁপিটা খুলে একটা ছবি বার করে। বার বার চেয়ে দেখে সংগিনীর দিকে। পর্যাপ্ত আলোর অভাবে মিলাতে পারে না দুটি মুখ। একটি বহু দূরে অপস্রিয়মান কিন্তু অপরটি তো তারই সংগে হেঁটে চলেছে—রক্ত মাংস উত্তাপে জীবন্ত।

এই যে গলিটা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলাম, কত নম্বর বলুন তো?

পঁচিশ। মেয়েটি বলে, ধন্যবাদ আপনাকে। এতটুকু পথের জন্য রিক্সা ভাড়া করতে চাইছিলেন? দুজনে আসতাম কি করে? আপনি যে কি উপকার করলেন—ধন্যবাদ! মেয়েটি এগিয়ে গিয়ে একটা বাড়ির নম্বর দেখে কড়া নাড়া আরম্ভ করে।

এক্ষুণি অদৃশ্য হয়ে যাবে। তবু অমিয় কুয়াশার ভিতর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। সিগারেট ধরায়। সে শুনতে পায়—

স্থলতাদি, স্থলতাদি !

কে গা ?

অম্বিকা চক্রবর্তীর স্ত্রী স্থলতাদিকে খুঁজছি।

কে অম্বিকে চক্কোবর্ত্তী ? সে তো এখানে থাকে না। নম্বর ভুল হয়েছে বাছা—অন্য বাড়ি দেখ! স্থলতা বলে তো কারুর নাম শুনিনি আজ পর্যন্ত।

এইটে পঁচিশ নম্বর নয় ?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ—তোমার নম্বর পঁয়ত্রিশও তো হতে পারে। ওরে বীণা তোর বরের নাম কি—অম্বিকে চক্কোবর্ত্তী নাকি ?

অ্যা মরণ আর কি ? প্রিতি মাসে ভাড়ার রসিদ দাও কার নামে ?

মেয়েটি ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে। অমিয় অদূরে দাঁড়িয়ে।

এখন আমি কি করি বলুন তো ? ভাগ্যে আপনার সংগে দেখা হল !

অমিয় যেন এই-ই চায়—এমনি একটা অসহায় অবস্থা। চলুন, চিন্তা করবেন না। যা হক একটা ব্যবস্থা হবেই।

খানিকটা হেঁটে একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায়। মেয়েটির মুখ থেকে কোনো প্রশ্ন বার হয়ে আসার পূর্বেই সে দেখে যে নরম গদির ভিতর তলিয়ে গেছে।

কিছু সময়ের জন্য মেয়েটি দিশা হারিয়ে ফেলে—অন্তত অমিয় তা ভাবে। অপরিচিত একটি নারীদেহ বার বার তার স্নায়ুচেতনাকে উত্তেজিত করছে। শীতের ভিতরও সে যেন ঘর্মাক্ত হয়ে উঠছে। একটা উত্তাপ অনুভব করে নাকে মুখে কপালে।

ট্যাক্সিতে উঠে শুধু একটা নির্দেশ দিয়েছে অমিয় সোজা চালাতে—কিন্তু কোন্ পথে ?

ভীরু কণ্ঠে মেয়েটি প্রশ্ন করে, কোথায় চলেছেন ?

তুমি যেখানে যাবে।

আমি, আমি শেয়ালদা ষ্টেশনে, কিন্তু ট্যাক্সি ভাড়া অত টাকা কোথায় পাব ? রাতটা না হয় ওখানে থেকে কাল চাকরীতে ইনটার-ভিউ দেব। আমার সংগে মাত্র পাঁচ সিকে আছে।

ট্যাক্সিচালক একটু থেমে পথ জিজ্ঞাসা করে নেয়। অমিয় যে পথ দেখায় তা শিয়ালদার পথ নয়।

ও, চাকরীর খোঁজে এসেছিলে ! থাক কোথায় ?

ঘুঘুডাঙ্গা ষ্টেশন থেকে মাইলটাক দূরে। আজ ইনটারভিউর কথা ছিল, কিন্তু হয়নি। কাল হবে বলেছে।

পাঁচ সিকেয় এতক্ষণ তোমার চলবে কি করে ? ভাতের কথা না হয় ছেড়ে দিচ্ছি, দু বার একটু চা জলখাবার খেতেই তো ও ফুরিয়ে যাবে।

না—তা যাবে না। তারপর সে নিম্ন কণ্ঠে বলে, আমাদের কি অত খরচা করা পোষায় ?

পুষিয়ে নিতে হবে, খরচ করতে হবে, নইলে ইনটারভিউতে স্থফল হবে না।

কেন, কেন ?

শরীরে না কুলালে কে ইনটারভিউ দেবে ? আর কলকাতার সহরে কি পয়সার অভাব একটু কুড়িয়ে নিতে জানলে ?

কলকাতা থেকে তো বেশী দূরে থাকি নে—আপনি কি ঠাট্টা করছেন ?

কেন, এ কথা কি নতুন শুনছ ?

অনেক শুনেছি, কিন্তু জীবনে প্রমাণ পাইনি।

চলো, আজ পাবে।

আবারও ঠাট্টা করছেন ? কিন্তু আর কত দূর শিয়ালদা ?

ঐ তো।

মোটরের হেড লাইট নেবে, কিন্তু জলে ওঠে ফ্ল্যাটবাড়ির লাইট। একখানা কোঠার দামী আসবাব ঝকমক করে ওঠে। একটা বিলেতি কুকুর অভিনন্দন জানাল ঘেউ ঘেউ করে।

এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন ?

তুমি যেখানে যেতে চাচ্ছ – শিয়ালদা। ফার্ষ্ট ক্লাস কমপার্টমেণ্ট, নইলে শীতে কষ্ট পাবে।

মেয়েটি যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রতিবাদ কিম্বা প্রতিরোধ করবার পূর্বেই ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

আমি চীৎকার করব।

কোনও কাজ হবে না—সে সময় উতরে গেছে।

মেয়েটি হেসে বলে, তবে প্রথম চায়ের ব্যবস্থাটা করতে বলুন।

অমিয় বিস্মিত হয়ে যায়। এখনও কি তার নেশা রয়েছে ?

অমিয় চায়ের হুকুম করে নিজের বেশবাস বদলাতে যায়। আচমকা মেয়েটির পরিবর্তন তার কানে বড্ড আনস্থরা ঠেকেছে। গজল গাইতে গাইতে আকস্মিক যেন রাগপ্রধান সংগীতে উত্তোরণ। তবে কি মেয়েটির সবই কৃত্রিমতা, সমস্তই মেকি ?

সেও কি অভিনব উপায়ে শিকার সন্ধান করে বেড়াচ্ছিল এই শীতার্ত সহরে ?

এখন আর নেশা নেই অমিয়র। তবু তার নেশা লেগেছে মেয়েটিকে দেখে। ওর চারিত্রিক নিষ্ঠা আজ আর বড় নয়, প্রাধান্য অর্জন করেছে নারীত্ব—যে স্বত্বের থেকে অমিয় চিরবঞ্চিত।

পায়জামার ওপর একটা গেঞ্জি ও র‍্যাপার চড়িয়ে অমিয় তাড়াতাড়ি ফেরে।

আমার ঘরে শাড়ি নেই, সে জিজ্ঞাসা করে, ধুতিতে চলবে?

কেন চলবে না? গরীবের মেয়ে সব অভ্যাস আছে।

অমিয় আলো জ্বালিয়ে বাথরুম দেখিয়ে দেয়।—কথার বেলা তো মনে হয় বিড়লা কিম্বা টাটার ভগিনী।

একটু বাদেই মেয়েটি ঘুরে এসে বলে, আমি কারুর বাসি কাপড় পরতে ভালবাসি নে। যদি ধোপাবাড়ির কাপড় না থাকে—

থাকবে না কেন, আছে, আছে—এই রাসকেল কি দিয়েছিস?

বয়টা ছুটে যায়।

কিছুক্ষণ পরেই মেয়েটি একখানা ফিনফিনে ধুতি পরে সোফায় এসে বসে। আলোর ঝলকে সায়ার লেসটা পর্যন্ত চকচক করে ওঠে।

এই র‍্যাপারখানা নাও, আমি না হয় আর একখানা এনে গায়ে দিচ্ছি। অমিয় নিজেই জড়িয়ে দেয় চাদরখানা। ও কি, অমন করলে যে?

বড্ড শীত, গায়ে যেন কাঁটা দিচ্ছে।

এবার তো ধোপখাওয়ান নয় বলে আপত্তি তুললে না?

পশমী কাপড় সব সময়ই শুদ্ধ।

দেখছি শাস্ত্রজ্ঞানও আছে টনটনে। এমন আইবুড়ো বিধবা আমার নজরে পড়ল এই প্রথম।

আপনি অনুগ্রহ করে একটা রাত্রির জন্য আশ্রয় দিয়েছেন, যা খুশি বলতে পারেন।

চোখের পাতা দুটি যেন সজল হয়ে ওঠে মেয়েটির।

অমিয়র পিত্ত জ্বলে যায়। এত ন্যাকামীও জানে মেয়েরা।

চা আসে। অমিয় আপ্যায়ন করে, চা খাও!

আপনি?

এই তো খাচ্ছি।

অমিয় চা খাবে কি, মেয়েটির পাতলা দুখানা ঠোঁটের দিকে চেয়ে থাকে আড়চোখে। পেয়ালার প্রতিটি চুমুক সে যেন চুমুক দিয়ে নেবে এক্ষুণি। সামান্য একটু প্রসাধনে কেমন অনবদ্য দেখাচ্ছে মুখশ্রী! সে ভুলে যায় একটু পূর্বের সব বাক্‌বিতণ্ডা।

কিন্তু কি আশ্চর্য, মেয়েটি ধীরে ধীরে কোন অপূর্ব ভংগি না করে ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল গরম চা-টুকু।

এমন সময় নৈশ আহার্য পরিবেশন করে যায় বয়টা। মেয়েটি কোনও অনুরোধের অবকাশ না দিয়ে খেতে থাকে গোগ্রাসে।

অমিয় নীরবে চেয়ে আছে—সময় কেটে যাচ্ছে নীরবে। আজ দেয়ালের ঘড়িটাও কেন যেন বন্ধ!

পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করে আরও দুখানা পরটা ও ব্যঞ্জন দিয়ে যায় বয়টা। অবশেষে আরও খানিকটা মিষ্টি সামগ্রী।

হাত-মুখ ধুয়ে মেয়েটি বলে, ওকি, আপনার দেখি এখনও চা-টাই খাওয়া হয়নি!

তাই না কি! এ্যাঁ, এক্কেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। অমিয় পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে খাবারের থালাটা টেনে নেয়। ঐটুকু খাবার খেতে তার যে কতক্ষণ গত হয় সে বুঝতে পারে না। সে ভাল করে খেতেই পারে না।

এক সময় সে স্বপ্নোত্থিতের মত বলে ওঠে, তুমি যে কথা বলছ না, রাগ করলে না কি?

মেয়েটি নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলে, না। এমন আতিথ্য পেয়েও রাগ করব?

আচ্ছা তোমার সংগে যে তুমি তুমি বলে কথা বলছি, তার জন্য তো কিছু মনে করোনি? তুমি একটি অপরিচিত ভদ্রমহিলা।

যেন লাস্যজড়িত কণ্ঠে মেয়েটি হেসে ওঠে।

এতক্ষণ আলাপ, তোমার নামটি তো বললে না?

ভদ্রমহোদয়ের জিজ্ঞাসা করার সৌজন্যও তো দেখলাম না।

সে ত্রুটি অবশ্যি আমি স্বীকার করে নিতে বাধ্য।

তা নয়, আমার সংগে দেখা হওয়া অবধি আপনি কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক।

না, না, না—রাঙা হয়ে ওঠে অমিয়। এ তোমার একেবারে ভুল কনক্লুসন। সে একটু ঘুরে বসে। তার পিছনের একটি ড্রেসিং টেবিলে উজ্জল আলো পড়ে। কতগুলি সাজান জিনিষ চিক-মিকিয়ে ওঠে।

এখন শুনুন, আমার নাম রেবা মিত্র।

কি বললে? সোজা হয়ে উঠে বসে অমিয়।

রেবা—!

তা আমি শুনতে চাই নে। তোমরা কি মিত্র বংশ সত্য বলছ?

অমিয়র কথার জবাব না দিয়ে মেয়েটি যেন চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করে, এ ফটোখানা আপনি কোথায় পেলেন? এ যে দিদির ছবি।

গিরিডিতে পরিচয় হয়েছিল প্রায় বছর তিনেক আগে।

শুধু পরিচয় নয়, ঘনিষ্ঠতা ছিল বলুন?

হ্যাঁ তা বলতে পার। তবে—। এ ছবিটা এখানে এল কোত্থেকে রে?

বয় জবাব দেয় যে একটা পুরান স্যুটকেশ ছিল—আজ সে ফ্রেমে এঁটে ওখানে রেখেছে। সে হতবুদ্ধি হয়ে থাকে।

রেবা উচ্চস্বরে বলে, না, না, নিশ্চয় ঘনিষ্ঠতা ছিল—নইলে হঠাৎ কেউ কি কোন অপরিচিতার ফটো তুলে ঘরে বাঁধিয়ে রাখে? আপনি অন্য কথা বললে বিশ্বাস করব কেন?

আমি তো অস্বীকার করছি নে। তুমিই তো কিছু বিশ্বাস করতে চাইছ না।

তবে আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এখন দিদি কোথায়?

কেন, গিরিডিতে!

সব জেনে শুনেও আপনি আবার ঠাট্টা করছেন? উঃ!

আমি তো কিছুই জানি নে রেবা।

অনেক চেষ্টার পর দিদি গিরিডিতে চাকরী পেয়েছিল। কর্তৃপক্ষ কিছু দিনের মধ্যেই নোটিশ দিলে সারপ্লাস বলে। দিদি কলকাতা ফিরে এসে গায়ের রক্ত জল করে চাকুরী খুঁজল, কিন্তু লাভ হল না। মনের দুঃখে সে একদিন কোথায় যেন ডুব দিল। বাবা বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন, আমার পড়া হল না।...

আবেগকম্পিত কণ্ঠে অমিয় বলে, ঘরে ঘরে এই তো ইতিহাস, তুমি দুঃখ কর না রেবা।

তবু মেয়েটির দু' চোখ বেয়ে বড় বড় দু' বিন্দু অশ্রু ফটোখানার ওপর ঝরে পড়ে।

আজ তুমি বড় পরিশ্রান্ত, এখন ঘুমাও, কাল সব বলব ও শুনব। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে অমিয় দ্রুতপদে অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে রেবার চোখ দুটো মুছিয়ে দিয়ে যায়।

॥ কল্যাণ স্বাক্ষর ॥

টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে।

'তুমি যাবে না, ওগো তুমি যাবে কিনা বল না? একটি কৌতূহলী গ্রাম্যবধূ এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে। পঞ্চানন পুকুর ঘাটে বসে অঙ্কুরিতপ্রায় বীজধানগুলো পরীক্ষা করে দেখছে—আরও জল খাওয়াতে হবে কিনা, সে জবাব দেয়, 'কেন বৌ, তুই যাবি না কি, এত যে তোর উদ্যোগ! সাধে পাড়ার লোকে বলে নাচুনে বৌ!' কর্মক্লান্ত পঞ্চানন স্ত্রীর দিকে সস্নেহে তাকায়। বর্ষার প্রদোষালোকে স্ত্রীর মুখখানা সুন্দর হলেও খুব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু অব্যক্ত এক উপলব্ধিতে ভরে যায় তার অন্তর। তার ভিতর জ্বলজ্বল করে একটি নতুন গড়িয়ে দেওয়া স্বর্ণ বেসর।

বড় কষ্ট করে স্যাকরার কাছে ধার বাকি রেখে তৈরি করে দিয়েছে পঞ্চানন। প্রাণান্ত করে দিয়েছে বলেই তার বোধ হয় এত তৃপ্তি। পঞ্চাননের একটু বেশি বয়স। লতার সঙ্গে ঠিক যা মিশ খায় না। তাই পঞ্চানন ওকে ভুলিয়ে রাখতে চায় সর্বদা।

এক এক সময় পঞ্চাননের মনে হয়—সে বড় লজ্জার কথা, কারো কাছে বলাই চলে না—বয়সের উঠতি সময় বিয়ে করলে, লতার মত মেয়ে থাকা সম্ভব ছিল ঘরে। সেইজন্যই ভালবাসার স্থলে স্নেহটা এসে পড়ে। আবার ভয় হয়, ও না বিশেষ কোনও আবদার জুড়ে বসে।

এক্ষুণি হয়তো বলল কিনা, আমিও যাব।

লতা আবদার না করে বা অন্য কিছু না বলে, পুকুরঘাট থেকে চলে আসে। তার হঠাৎ গাম্ভীর্য, শ্রীচরণের দুম দুম পদপাত শঙ্কিত করে

প্রৌঢ় স্বামীকে। ক-দিন ধরে আকাশে দুর্যোগ চলছে—এখন কাল-বোশেখীর ঝট্‌কা আসা নিতান্তই আকস্মিক। তবে নতুন পোয়াতী, শহুরে সংস্করণ—গেঁয়ো পুরুষের পক্ষে মেজাজ বোঝা দায়।

পঞ্চানন তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে এসে জিজ্ঞাসা করে, আবার কি হল? যদি যাবি তো চল, কিন্তু আর কোনও বাড়ির বহুড়ি যাবে না, এ তোকে নিশ্চিত বলে দিচ্ছি। আর তোর পক্ষে এসময় নায়ে চড়া...'

লতা কথা বলে না।

ছাগল ছানা দুটোকে একটা ডালা দিয়ে ঢেকে রেখে পঞ্চানন ফের প্রশ্ন করে, 'আপনায় হল কি? কথা বলছেন না কেনে!'

এত যার উৎসাহ সে পরম অসহযোগী হয়ে থাকে। ঘর অন্ধকার হয়েছে, তবু প্রদীপ জ্বালে না লতা। 'আজ কি আমরা আঁধারেই থাকব?'

'একটুখানি তেল আছে, তা দিয়ে আমার পিণ্ডি চটকাব, না পিদ্দিম জ্বালব।' এখানে পিণ্ডি অর্থে বেগুন পোড়া।

পঞ্চানন হেসে ওঠে 'তা হলে ঠিক তেলের অভাব নয়, অন্য কিছু ঘটেছে। বিনে তেলেও নঙ্কা দিয়ে বেগুন-পোড়া মেখে খাওয়া যায়।'

'যাবে না কেন, কুমীরের মুখে সব রোচে, তার তো স্বাদ-স্বোয়াদের বালাই নেই।'

স্বাদ-স্বোয়াদ না থাকলে তোকে আর বিয়ে করে এ বয়সে ঘর পাততাম নি। সন্নেসী হয়ে বনে বনে ঘুরতাম।' লতা গর্ভবতী। লতাকে মধ্যবিন্দুতে রেখে আরও অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের মত পঞ্চাননের বুকের কাছে ঠেলে আসে। তা ও ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করতে পারে না। ওর গলা ধরে আসে। প্রদীপ জ্বলে। দেখলেই বোঝা যায়,

যত ছোটই হোক ঘরখানা নতুন তোলা হয়েছে। বাঁধন-ছাদন এখনও সম্পূর্ণ দেওয়া যায়নি। বোধ হয় সময়াভাব। সময় মানেই কিন্তু অর্থ। জোত-জোয়ালও নতুন। কাটারীখানা পর্যন্ত।

বৃষ্টি একটু চেপে এল।

'পঞ্চুদা বাড়ি আছ? শীগগির দোর খোল। দাঁড়ান যায় না।

পঞ্চানন ঝাঁপ সরিয়ে দেয়। কাদা পায়ে ঘরে এসে ঢোকে বিলাস নবীন, নিতাই। 'তুমি যাবে না?'

'যাব তো—'

নৌকা ঘাটে তৈরি—বড় ঘাসি নাওখানা নবীনের। খালের ওপারের সবাই যাবে ছিদামের জেলে ডিঙিতে।

'আমিও যাব। তামাক খাবে?'

'না সময় নেই। কিন্তু তুমি যে যাবে, তার তো কোনও তোজজোড় দেখছিনি।'

'তোড়জোড় করতে আর কতক্ষণ? চারডি মুখে দিলেই হল। ওগো ভাত হয়েছে?'

ঘোমটার ভিতর থেকে জবাব আসে, 'না'।

সকলে হেসে ওঠে। 'তুমি আর গেছ পঞ্চুদা।'

ওরা হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ে। কেউ বলে স্ত্রৈণ। কেউ বলে ভীমরতি ধরেছে পঞ্চুদার। এমন তো সে কস্মিনকালেও ছিল না।

কিছুক্ষণ বাদে পঞ্চানন বলে, 'তুই আমার কান দুটো কেটে এমন নুনও মাখিয়ে দিলি—তোর সাথে কি শত্তুরতা ছিল গত জম্মের?'

'ভাত কি এতক্ষণ হত না! তোমায় না বারবার নিষেধ করে দিয়েছি, কেন তুমি ফের বউ বলে ডাকলে। আমি কি আন্তিকালের

বুড়ি, না তোমার ঠাক-মা ? ডাকতে হলে আমায় ডাকবে লতা বলে, আবার মনে করিয়ে দিলাম, নইলে ফের জব্দ হবে।'

কিন্তু নয়ালী খেজুরের গুড়ের দান্ধার মত যে বৌ ডাকটি। পঞ্চানন চিন্তায় পড়ে।

'কথা যখন দিয়েছি, বারোয়ারী চাঁদা যখন তুলেছি আমায় যেতেই হবে। আমি আর খাবনি। পারলে দুটো চিঁড়ে মুড়ি দে।'

'আমি তো তোমার মত চিঁড়ে মুড়ি চিবিয়ে যেতে পারব না।'

'বলিস কি! একে ভাদ্দর মাস, তায়, ঘোর অমাবস্থে তুই যাবি সাথে? তোর পেটে যে সন্তান লতা। আমি ফিরে এসে তোকে সব বলব। একটি কথাও বাদ যাবেনি।'

তা হবে না। লতা যাবেই যাবে। ও সব কুসংস্কার লতা মানে না।

না মানার একটু হেতু আছে—

তেরশ পঞ্চাশের আকালের সময় হঠাৎ লতার বাপ মারা যায়। শহরে নিম্নমধ্যবিত্তের অভিভাবকের মৃত্যু মানেই সমগ্র পরিবারের জীবন নিয়ে টানাটানি। শোকের দু-বিন্দু অশ্রু জল পড়তে না পড়তেই দাবাগ্নির মত অভাবের আগুনে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

লতাকে ও তার মাকে নামতে হয় ঝি-গিরি করতে। যে বাড়িতে লতা কাজ করত সেখান থেকে রাত্রে ব্ল্যাক আউটে গোরা পল্টনদের ভয়তে এক এক দিন বাসায় ফিরতে পারত না ও। বড়লোকের বাড়ি নয়, নিতান্তই মধ্যবিত্তের ঘর। এক দিদিমণি ছিল সেখানে। নামটি তার আজও মনে আছে লতার—মৈত্রেয়ী। সে ছিল পোয়াতী। সেই অবস্থায়ও রোজ সে স্বামীর সঙ্গে রাত্রে বের হত কতগুলো

কাগজপত্র নিয়ে। দিনে দিদিমণি যা লিখত, রাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে তাই নিয়ে বের হত। কী সুন্দর যে ছিল দিদিমণির হস্তাক্ষর।

শ্রান্ত হয়ে ফিরে আসত মধ্যরাত্রে।

সকালবেলা লতা অবাক হয়ে দেখত, যে গরম গরম কথাগুলো আঁটা রয়েছে অলিতে গলিতে, তা মৈত্রেয়ীদির হাতের লেখা। লতা বেশ কিছুটা লেখা-পড়া শিখেছিল আপার প্রাইমারী স্কুলে। ওর বাজার নিয়ে ফিরতে দেরি হয়ে যেত। ও দেয়ালে দেয়ালে চোখ না বুলিয়ে, কিছুতেই পথ চলতে পারত না। গায়ের রক্তে কেমন একটা উত্তাপ অনুভব করত। এক এক দিন মাছের পয়সা হয়ত গুলিয়ে ফেলত ডালের পয়সার সঙ্গে।

দিদিমণি সস্নেহ তিরস্কারের সঙ্গে বলত, 'মুখ্খু মেয়ে।'

কিন্তু ও-যে মূর্খ নয়, ও-যে বর্ণজ্ঞানহীনাও নয়, একদিন তার প্রমাণ দিতে গিয়ে দেখল যে বাড়িটা তালা মারা। পুলিসে নাকি খানাতল্লাশ করে ধরে নিয়ে গেছে দিদিমণি আর তার স্বামীকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চলে আসে লতা মার কাছে। কিছু বেতনও বাকি ছিল ওর।

সংসারের ঘড়ির কাঁটা আবার বন্ধ হয় হয়, এমনি সময় পঞ্চাননের সঙ্গে দেখা লতার মার। পাশের ভাড়াটে পঞ্চাননের বন্ধু। সে-ই যোগাযোগ করে দেয়।

পঞ্চানন উদ্বাস্তু হয়ে নানাস্থানে ঘুরেছে। যুদ্ধের বাজারে মুটের কাজই করেছে বেশি মিলিটারির সঙ্গে। চাটগাঁ, আসাম এবং আলমোড়া। তেমন কিছু জমাতে না পারলেও সামান্য কিছু সঞ্চয় করেছে। মনে আকিঞ্চন দেশে ফিরে একটি নীড় বাঁধবে। সকলে তো আর ভবঘুরে হয়ে সুখ পায় না। চাষার ছেলে—নেশাও ছিল

লাঙল জোয়ালের। দুটি স্বাস্থ্যবান বলদ ও অন্তত পক্ষে একটি থাকবে দুধের গাই। আর সামান্য কিছু সরস ভুঁই।

অথচ এখন পর্যন্ত পঞ্চাননের তেমন কিছুই নেই।

লতার কথা আঁধারে বিদ্যুৎলেখার মত জ্বলে উঠল ভবঘুরের মনে।

পঞ্চাননের এমনি একটি ডাগর মেয়ের প্রয়োজন। কিন্তু আশার অতিরিক্ত সে শুনল লতা নাকি লেখা-পড়া জানে। পঞ্চানন চকচকে নোটগুলোতে হাত দিয়ে নিজের মনের বল্‌গা টানে সজোরে। ওরে অত উতলা হওয়া ভালো নয়। জগতে যা কিছু দেখবি, তাই তোর প্রাপ্য নয় রে।

প্রথম দেখার সময় পঞ্চানন বন্ধুর মারফত কথা একটা পাড়ে—'তার তো বয়স হয়েছে।'

লতার হয়ে মা জবাব দিতে আঁকু পাঁকু করে।

পঞ্চানন বাধা দেয়, 'আপনি থামুন। তাঁকে বলতে দেন।'

লতা বলে, নিতান্ত সরলভাবেই বলে, 'উপোসের চাইতে কি চিঁড়ে কষা?' তারপর সে উঠে যায়।

সরল হলেও পঞ্চাননের এ উত্তর ব্যাখ্যা করে বুঝতে কিছু সময় কাটে। সে লতাকে নিয়ে বাড়ি আসে। এবং কয়েকটা বছর পরের কথাই হচ্ছে আজ।

এখনও বৃষ্টি ঝরছে তেমনি করে। স্বামী-স্ত্রীর খাওয়া হয়ে গেছে ভাত।

'তুই যখন নাছোড়বান্দা তখন চ, কিন্তু থাকলেই ভালো হত লতা।'

'তোমার সঙ্গে আমিও কি কথা দিইনি? আইনের ঘরে দুজনেই

তো সমান আট্‌কা, তবে একা একা যেতে চাচ্ছ কেন মশাই ? স্ত্রীলোক বলে আমার বুঝি শোনার বোঝার কিছু নেই ?'

'থাকবেনি কেনে ? কিন্তু তুই যে এখন…'

'সেই দিদিমণির কথা দেখি তোমায় কতবার বলেছি। সহুরে মেয়ে যখন ঘরে এনেছ, তখন ওসব মান্ধাতার আমলের ছেঁড়া কাঁথা দূর করে ফেলে দিতে হবে। জানো বর্মাদেশের মেয়েরা কি করে ? তাদের বুঝি ছেলে-পুলে হয় না ?'

'চুপ চুপ তুই আর আমার ওপর বিদ্যে ফলাসনি। শীগ্‌গির শীগ্‌গির বের হ। কিন্তু ঘর-পাহারা থাকবে কে ?'

'কেন ক্ষেন্তি মাসীকে দু-পয়সার দোক্তা কবুল করে আন না! পুরুষ বলে তো খুব গর্ব কর, সময়মত দেখি এটুকু বুদ্ধি মাথায় খেলে না! জানো, পাহাড়ী মেয়েরা…'

পঞ্চানন প্রথম কানে আঙুল দেয়, তারপর ক্ষেন্তি মাসীকে ডেকে নিয়ে আসে।

ইতিমধ্যে চিঁড়ে, গুড়, তামাক, তাওয়া, লণ্ঠন সংগ্রহ করে নেয় লতা। লাঠি একটাও বাদ যায় না।

ওরা খালের ঘাটে গিয়ে দেখে যে একখানাও নৌকা নেই।

'এখন ?'

পঞ্চানন মন্তব্য করে বেশ একটু বিরক্ত হয়ে, 'সাধে বলে পথে নারী বিবর্জিতা !'

'পণ্ডিত মশাই ও কথা বিয়ে করা স্ত্রীর জন্যে নয়। পথে ঘাটে মেয়েলোক দেখলেই যদি নোলায় জল আসে, সেই জন্যই শাস্ত্রে বারণ আছে অপরিচিত স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিতে, কত লোক যে মায়াবিনী রাক্ষুসীর পাল্লায় পড়ে নাস্তা-নাবুদ হয়েছে !'

'তুই আমাকে শেখাবি বৌ, বড্ড তোর বাড় বেড়েছে।'

লতার রাগ হওয়ার পালা এবার, কিন্তু সে হজম করে যায় পঞ্চাননের কথা। আর মাত্রা চড়ালে হয়তো এমন যাত্রাটাই স্থগিত হয়ে যাবে। জীবনে পরম ক্ষণ, বহু ঈপ্সিত অভিযান অনেকবার আসে না। কারো কারো বেলা মোটেই হয়তো দেখা দেয় না। এ সুযোগ লতা দাম্পত্য কলহ করে নষ্ট করবে না। পঞ্চানন এত সময় মূঢ় হয়েছিল অনভিপ্রেত শব্দটি উচ্চারণ করে।

লতা বলে, 'তবে একখানা ডোঙা দেখ না। হোগলা দিয়ে ছই দিয়ে নিলেই হবে।'

'ভালো কথা। তুই একটু দাঁড়া, আমি এলাম বলে।'

অন্ধকার। নির্জন। তাতে যেমন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি, তেমনি ঘন ঘন ব্যাঙের ডাক। পেত্নীর হাত নয়তো ঐ গাব গাছের ডালটা? শহুরে সাহস জলে ভিজা মুড়ির মত মিইয়ে আসে।

'ওগো'—

'বুঝেছি, পেছু পেছু আয় ঝট্‌পট্।'

অনেকগুলো বোঝা নিয়ে লতা লট্‌পট্ করতে করতে স্বামীকে অনুসরণ করে চলে।

একটু বাদেই সোঁতা খালের সরস মাটির ওপর দিয়ে সড়াৎ করে বড় খালের জলে পিছলে পড়ে একখানা ছোট্ট নাও।

'মাগো…!' লতা পেটে একটা ব্যথা অনুভব করে।

'ভয় নেই। নড়িসনি। চুপ করে শুয়ে থাকে মাঝ বরাবর। কাত্ দিসনি কোনও দিকে, জল উঠবে কিন্তু একটু এদিক ওদিক হলে।'

'কথা বলতে তো বারণ নেই।'

'না, তবে কম বলাই ভালো। মাথা ঘুরে গা বমি বমি করতে পারে নতুন চলনদারের।'

প্রথম ধাক্কাতেই তাই আরম্ভ হয়ে গেছে লতার। কী জোরেই যে বড় খালে পড়ল। সে লণ্ঠনটা কমিয়ে নারকেলের মালার সাহায্যে গোপনে জল তুলে মাথায় ঢালে।

অনাগত সন্তানের তো কোনও ক্ষতি হবে না? ওর উচিত ছিল না আসা। মা হয়নি এখনও, তবু ওর কাঁধে দায়িত্বের বোঝা এসে পৌঁছে গেছে—ভালো মন্দ শুভাশুভের।

কিন্তু অনাগত বংশধরদের জন্যেই শুধু নয়, যারা বর্তমানের আশা আকাঙ্ক্ষার স্থল—স্বামী স্ত্রী মাতা পুত্র ভগ্নী সকলের কল্যাণ কামনায়ই তো এ শুভযাত্রা। সেই কথাই তো লতা পরম সত্য বলে জেনেছে। এখানে যাওয়াই মানে দু-হাতে মানবতার মঙ্গল কুড়িয়ে আনা। তাই লতার গর্ভস্থ শিশুর কোনও অকল্যাণ হতে পারে না।

নৌকা চলে…জলে বাদলে বৈঠা পড়ে।

'আর কদ্দূর মাঝি?'

'ওই, তোকে নিয়ে আমার হয়েছে জ্বালা। নায়ে উঠতে না উঠতেই কদ্দূর? কেনে, ভালো লাগছেনি বুঝি, নামতে ইচ্ছে করছে নাকি? বলিস তো হিঙ্গুলতলির ছাড়া ডাঙায় নামিয়ে দিতে পারি। ভোর নাগাত সেথা পৌঁছাতে পারলেই বুঝবি আমাদের ভাগ্যি। তোর জন্যই তো যত দেরি।'

'কিন্তু মাঝির যে মুরদ কম সে কথা বলে কে?' ব্যথাটা একটু যেন কমেছে।

পঞ্চানন লতার এ বক্রোক্তিতে আনন্দ পায়। জবাব দেয়, 'নাচুনে

চলনদার নায়ে থাকলে তার রঙ্গ-রসে নৌকো যদি একটু ভার চলে তো দায়ী কে?'

বিদ্যুৎ ঝলকায় মাঝে মাঝে। চলকে চলকে ওঠে খালের মেঘলা কালো জল।

টলমল করে এগিয়ে চলে বৈঠার তালে তালে ছোট্ট এই নাও। খুব বড় খাল নয়, তবু পার কিনার একাকার মেঘের চাঁদোয়ায়। একটু সুস্থ বোধ করা মাত্রই লতা উঠে বসে।

'ওটা কি?'

'কোনটার কথা বলছিস?' সজোরে বৈঠায় চান্নি (চাড়) দেয় পঞ্চানন। দ্রুত পিছে ফেলে যেতে চায় দৃশ্য বস্তুটা।

'বাঃ রে নৌকা থামালে না যে?'

'তোর কথামত কেবল নাও থামাই আর কি, তা হলেই যাওয়া হয়েছে! ওরকম কত কি যে আছে খালের দু-পারে।'

'জিনিসটা কি?'

'কি করে জানব?'

'না, নিশ্চয় জানো, বলতেই হবে।'

'একটা ঘোড়ার ডিম।'

'তাই নাকি! কুরুক্ষেত্র হবে কিন্তু বলে দিচ্ছি। লণ্ঠনের ঢিমা আলোটুকুতেই বেসরটা ঝকমক করে ওঠে। বোঝা যায় লতা ক্রুদ্ধ হচ্ছে।

'কৃষাণেরা দুটো বাঁশের আড়কাটি বানিয়ে তাতে বোধ হয় মানুষের মত নেকড়া জড়িয়েছে। মাথায় দিয়েছে একটা কালো হাড়ি, চুন দিয়ে নাক-মুখ এঁকে। ফসল নষ্ট করে কিনা পাখপাখালিতে—বুঝলি অনেক কষ্টের ফসল।'

'না, বিশ্বাস হচ্ছে না। মরা ডাঙায় ফসল, শুকনো খালে নাও, এ হতে পারে না!'

'তবে তুই আঁধারে কিসে কি দেখেছিস বলতে পারি নি?'

'না পারা এক কথা, ভুল বোঝানো আরেক কথা। শেষটার যদি মাশুল দিতে হয় তো তোমারই ক্ষতি হবে বেশি।'

পঞ্চানন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ওর সকল আতঙ্কই অন্তঃসত্ত্বা লতাকে নিয়ে।

পঞ্চানন ফাঁপরে পড়ে চুপ করে থাকে। কবে তেরশ পঞ্চাশ গেছে, তার চিহ্ন কি এখনও এখানে থাকা সম্ভব? হয়তো কিছু ভুল দেখেছে লতা। কলা গাছের কচি পাতাকেও তো কত লোকে এমন রাত্রে ঘোমটা দেওয়া বৌ ভেবে আঁতকে ওঠে। কিন্তু ওর ব্যাখ্যাটাও তো হয়েছে ভুলের সঙ্গে আরও একটা গুরুতর সংযোজন। আবার বিদ্যুৎ ঝকমকিয়ে ওঠে।

'ঐ তো একটা মড়ার খুলি—ও বাবা! এবার তো আর কিসে কি দেখিনি। এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে? পথ ভুল করনি তো? এ কি শ্মশান?'

'না লতা। এইটেই তো বেলডাঙা বুড়ো শিবতলার খাল।'

তবু লতার বিশ্বাস হয় না। পঞ্চাননকে বারবার শুধায়। পঞ্চানন একই জবাব দেয়।

লতা বলে, 'আমি যদি জোর করেই এসে থাকি, না বুঝেই আবদার করে থাকি, আমার ওপর রাগ করে তুমি যেন তোমার নিজের পায়ে কুড়ুল মের না। আমার পেটে কিন্তু তোমার—'

'জানিরে এমন ভুল পঞ্চানন আজ আর করবেনি লতা। তুই ভয় পাসনি। আঁধার বলে আমি দিক হারাইনি। এপথে কি আজ নতুন

চলাফেরা করি। এইটেই হচ্ছে সব চেয়ে সোজা পথ, হয়তো ওদের আগেই কোন্ না পৌছে যাব। যে মানত আমরা করেছি, তাতে কি কারো অকল্যেণ হতে পারে ?'

লতা চুপ করে থাকার প্রয়াস পায়। আরও খানিকটা পথ অতিক্রম করে আসে নৌকাখানা। আলোর বালাই নেই, কেবল বিশ্বব্যাপ্ত অন্ধকার। বাইরের দিকে তাকাতে ভরসা হয় না লতার, তবু যেন চোখ দুটো বাইরেই নিবদ্ধ হয়ে থাকে। জনমানবহীন এ সুদীর্ঘ প্রান্তর তার কাছে যেন অসহ্য বলে বোধ হয়।

আবার ব্যথাটা টের পায় লতা। সে দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজে থাকে।

লতার এ মানসিক অবস্থা পঞ্চাননের কাছে ভালো ঠেকে না। এ যেন কেঁচো খুঁড়তে সাপ উঠল। কেমন আনন্দেই চলেছিল আমুদে-আবদারে তরুণী স্ত্রীকে নিয়ে—মাঝখান থেকে ফ্যাসাদ। এ স্থানটা ঠিক শ্মশান নয়, কিন্তু একটা মর্মান্তিক স্মৃতি রয়েছে এ জায়গাটা জুড়ে।

'তবে শোন লতা—তোর ভয় ভাঙিয়ে দি। ঢেকে রাখলে তোর মন গুড়গুড় করবে, তার চাইতে খুলে বলাই ভাল। তুইও যে কিছু কিছু না জানিস তা নয়। একটু সবুর কর, একটা দমকা ফোঁপানি আসছে।' পঞ্চানন বৈঠা ধরে শক্ত হাতে।

লতা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে। পঞ্চানন ভুল ভাঙিয়ে দিতে চাইলেও ওর শঙ্কা কাটে না।

উড়ে চলে নৌকা,—বৃষ্টি বাদলের মধ্য দিয়ে ছল ছল ছলাৎ করে। জনহীন প্রান্তর, গ্রাম, অটবী সরে যায়। মেঘ কখনও ঘন হয়ে আসে, কখনও বা ফ্যাকাশে, ছড়ান। আকাশে এই তারা নেই, এই আবার গুটি কয়েক নক্ষত্র। কিন্তু ওরাও ভয়ার্ত যেন!

পৃথিবীর বুক চিরে চিরে যাচ্ছে খাড়া-ঝিলকির শানিত কৃপাণে।

ঘণ্টাখানেকের পথ পেরিয়ে আসে ডোঙাখানা মিনিট কয়েকের মধ্যে।

পঞ্চানন দেখায় অজস্র জংপড়া কাঁটাতারের বেড়া। গাছপালা এখানে ওখানে কাত্ হয়ে আছে। গৃহস্থের ঘর দুয়ার সব ভাঙা-চোরা, কোথাও বা আধ পোড়া পড়ে রয়েছে। শিশু কাঁদে না, কুকুর ডাকে না। দেখা যায় না ফসল-ফলা মাঠ। পথে ঘাটে পড়ে আছে মরা গাছের গুঁড়ি, য়েন দিন গুণছে কবে দিন আসবে। লতা হয়েছে, জঙ্গল জন্মেছে উৎখাত মানুষের ভদ্রাসনে।

যুদ্ধের ঘাঁটির পরিকল্পনা করে মানুষ সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল হিঙ্গুলতলির ছাড়া ডাঙায়। উর্বর জমি জল ও গ্রামের স্বত্ব থেকে অনুর্বর প্রান্তরে। শান্তির নীড় থেকে শ্মশানের চিতায়। পঞ্চানন বলে।

তারই পরিণতিতে স্থানীয় দুর্ভিক্ষ। সে দুর্ভিক্ষে আরও ইন্ধন জোগাল তেরশ পঞ্চাশ। 'ভাত চাইনে, ফ্যান দে মা একটু—শুধু ফ্যান।'

'মানুষ বিক্রি হতে শুরু হল লতা। বুড়ো-ধুড়ো নয়, সুন্দর বাছা বাছা যুবতী, যারা কখনও ঘর ছেড়ে বার হয়নি। আগে কখনও এ সব আমরা শুনিনি। হিঙ্গুলতলির মাঠে কেবল মরা কান্না। কেউ কেউ করলে ইজ্জৎ বাঁচাতে আত্মহত্যা।'

লতা বলে, 'থাম তুমি। শহরে বসেও তেরশ পঞ্চাশ দেখেছি—কিন্তু এমন তো ভাবতে পারিনি।'

পঞ্চানন থামে না—অভিজ্ঞ শল্যচিকিৎসক যেমন পচা ক্ষতের শেষ প্রান্তে না গিয়ে অস্ত্র সংবরণ করে না। সে স্থান কাল পাত্রের কথা ভুলে গিয়ে সহসা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তার অবচেতন মনের সঞ্চিত লাভা আজ যেন মুখ খোলে।

'যুদ্ধ আর মিলিটারির সাথে দোস্তালি করে আসে আকাল আর

মড়ক। এ বা কি দেখলি, যেখানে সত্যি যুদ্ধ হয়, সেখানের কথা মুখে বলে বোঝান যায় না।' সে দৃষ্টান্ত দেয় অনেকগুলো—এসে পড়ে হিরোসিমা, নাগাসাকি।

'আমি আর শুনতে চাইনে। ওগো তুমি থামো। আজ তো এসব এখানে শুনব বলে আমি আসিনি। তুমি থামো না একটু!'

'থামতে তো চাই, কিন্তু থামতে দিচ্ছে কই শত্তুররা? আমরা তো শান্তিই চাইরে।' পঞ্চাননের মনে পড়ে ছোট্ট নীড়টির কথা—যেন সন্তান হয়েছে লতার। যেন ধান উঠেছে উঠানে। আনন্দের যেন বান ডেকেছে স্বল্পতুষ্ট চাষীর অন্তরে। এমনি সময় যদি কেউ ঠেলে ভেঙে দেয়—সহ্য হয় না, কল্পনা করা যায় না সে কথা!

বৈঠাটা দৃঢ় হাতে জড়িয়ে ধরে খানিক বেয়ে চলে পঞ্চানন। সে স্থির করে আর কিছু বলবে না। কিন্তু যে চরম লাঞ্ছনা সে বিগত জীবনে পেয়েছে তার দাহ তো ইচ্ছা থাকলেও কমাতে পারে না। ভালো, মন্দ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী বহুলোকের সংস্পর্শে এসেছে—জেনেছে যে মর্মান্তিক গ্লানির কথা তা এখানে অহেতুক হলেও চুম্বকের মত বেরিয়ে আসে তার মুখ দিয়ে। যুদ্ধবাজদের মুনাফার পাহাড়ই আমাদের কংকালের ওপর গাঁথা।

লতা আবার থামতে অনুরোধ করে। কিন্তু নৌকা আজ আর থামে না। একটা সামান্য ভবঘুরে চাষী ঠকে ঠকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তা বলে যায় ঝড়ের বেগে।

'তুমি থামো গো, তোমার দুটি পায় পড়ি।' কিন্তু নৌকা দিকভ্রান্ত না হয়ে এগিয়ে চলে।

লতার কাছে আজ পঞ্চানন এক বিরাট পুরুষের ছাপ ফেলে—যার নয়নে স্বচ্ছ দৃষ্টি, অন্তরে বরাভয়। প্রলয়ের অন্তরালে, যে দেখতে পাচ্ছে মৃত্তিকার আশীর্বাদ।

বন্যার বাতাস একটু কমেছিল, কিন্তু আবার এল ফুঁপিয়ে। কাঠের নৌকা কাঁপতে লাগল কাগজের নৌকার মত। বৃষ্টির ধারা ছই ফুটো করে দিতে চাইছে। লতাকে আবার ব্যথায় অতিষ্ঠ করে তোলে, কী অবিমৃষ্যকারিতারই সে পরিচয় দিয়েছে!

'শক্ত হয়ে বসে থাক। ছইয়ের বাতা ধর দু-হাতে।'

লতা কি জবাব দেয় বোঝা যায় না।

এখানে ক্ষুদ্র বোঝা না বোঝার কথা নয়, অতি তুচ্ছ পাওয়া না পাওয়ার সাময়িক দ্বন্দ্ব নয়—শেষ কথাই হচ্ছে পাড়ি জমিয়ে সীমান্তে, গন্তব্যে পৌঁছান। তাই সে স্ত্রীর চাইতেও প্রিয় এবং শ্রেয় মনে করে বৈঠাটাকে বাগিয়ে ধরা, সমস্ত নৌকাটাকে নিরাপদে বাঁচিয়ে চলা।

লতা গোঁঙায়, কিন্তু পঞ্চাননের কানে তা যায় না।

ঝড় চলে সশব্দে। সময় কাটে জীবন-যুদ্ধে, ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে।

অকস্মাৎ বজ্রপাত হয় —একটা উঁচু গাছ জ্বলে পুড়ে যায় ওপারের।

চিৎকার করে ওঠে লতা। সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন শোনা যায় নবজাতকের।

পঞ্চানন বৈঠা থামায়, ঝড়কে সে অতিক্রম করে পাড়ি দিয়ে এসেছে। সেও তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে 'ওরে আর ডর নেই। ঐ তো বুড়ো শিবের দেউড়ি আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। ঐ তো—ওর পাশেই মাঠে মেলা বসে প্রতি বছর।

লতা সাহায্য চায়। পঞ্চানন মহা আগ্রহে সাহায্য করে। পার থেকে নিয়ে আসে বাঁশের চোঁচলার ছুরি। সন্তান মুক্ত করে লতার নির্দেশে। বিদ্যুতালোকে পঞ্চানন দেখে লতা ধারণ করেছে এক প্রশান্ত শ্রী। তার পাশে ওর জীবনধন, বংশপুত্তলি।

'চ্ লতা ফিরে যাই এখন।'

'বল কি, তা হয় কি করে? অমঙ্গলের ভয় কর না?'

আবার ধীরে ধীরে নৌকা চলে। মন্দাক্রান্তা তালে দণ্ড দুই কেটে যায়। এইবার প্রাণ ভরে তামাক খায় পঞ্চানন। সে সাময়িক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে। গৃহে তার সন্তানের মঙ্গল নয়, মঙ্গল রয়েছে যেখানে ওরা চলেছে।

মেঘ ও তারার আলোতে পঞ্চানন নাও ঠেলে। একা একা অনুভব করে আনন্দ। লতাকে ডাকে না নিজেও কথা বলে না। ঝড় মুক্ত ধরিত্রীর রূপ চলতি পথে পসরা মেলে। পঞ্চানন দেখে, কি যে সে ভাবে—তা কালির অক্ষরে ধরা যায় না। শিশু কাঁদে। লতাকে ডেকে বলে, 'দুধ দাও না!'

লতা জবাব দেয়, 'ওগো তুমি এস না!'

পঞ্চাননের বাদানুবাদ করতে ভালো লাগে না। সে আনন্দে ভরপুর।

ভোরের একটু আগেই চড়ায় এসে নাও ঠেকে। আকাশে প্রভাতী-তারা, দূরের একটা গাছে দোয়েল-দম্পতির শিস্! অতি প্রাচীন, অত্যন্ত সুপরিচিত হিজল গাছটাকে চেনে পঞ্চানন।

'এখন হেঁটে যেতে হবে ক্রোশটাক, ভাঁটার জল শুকিয়ে গেছে চরো-ডাঙার।'

লতার পক্ষে এখন চলা একপ্রকার অসম্ভব। এত দূর এসে ওর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না? এ কি সহ্য করার মত কথা! ও বিগলিত কণ্ঠে বলে, 'একটু ওপরে উঠে দেখ না, হয়তো ভুল করেছ তুমি—আরও তো ডাল থাকতে পারে খালের যাতে জল আছে।'

ওদেরই মত অনেকগুলো নাও পারা-দেওয়া (লগি পোঁতা) চরে। কিন্তু যাত্রী নেই একটিতেও। লণ্ঠন জ্বালিয়ে পঞ্চানন চরে ওঠে।

একটির পর একটি বলিষ্ঠ পদচিহ্ন নরম মাটির বুকে আঁকা।

তারপর আরও কতগুলি—একমুখি গতি সকলের। তারপর আরও···অবশেষে অজস্র···

'কি গো খালের সন্ধান পেলে—নতুন খালের ?'

পঞ্চানন চেঁচিয়ে উত্তর দেয়, 'পেয়েছি একটুন দক্ষিণ টানে সরে।'

লতা উত্তেজনায় ঘেমে ওঠে।

পঞ্চানন ফিরে এসে বলে, 'এত আগ্রহ থাকলে কি পথ না পেয়ে উপায় আছে রে!'

চরে দাঁড়িয়ে পঞ্চানন ডোঙাটাকে ঘুরায়। তারপর ঠেলে নিয়ে চলে সেই খালের উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যে গভীর জল না হলেও এমন জল পাওয়া যায় যে বৈঠা বাওয়ায় অসুবিধা হয় না।

ভোরের তারা আরও উর্ধ্বে ওঠে। পূব দিকে গেরুয়া মেঘের সামিয়ানা। সেই গেরুয়া সামিয়ানা ভেদ করে জাগে যেন সহস্রদল পদ্ম।

তরুণ সূর্য এসে শুভেচ্ছা জানায় নবজাতককে। এবার মন্দির চূড়ার বড় ফাটলটা পর্যন্ত দেখা যায় স্পষ্ট। দূরে কলরব শোনা যায়—বহুকণ্ঠের মিলিত উচ্ছ্বাস।

ক্রমে নিকটতর হয় সে ধ্বনিসমুদ্র। মাঠটা বোধ হয় ভরে গেছে সম্পূর্ণ মানুষের মাথায় মাথায়।

'কি যেন একটা ফটকের মত, কি যেন লেখা সব দেখাচ্ছে।' পঞ্চানন নিশ্বাস নেওয়ার জন্য বৈঠা থামায়। 'পড় তো লতা, পড়।'

লতা সাগ্রহে মুখ বের করে দেখে, ফটক নয়, সজ্জিত এক বিরাট তোরণ।

দুটি যুবক ওদের দিকে এগিয়ে আসে একখানা খাতা নিয়ে।
পঞ্চানন একটু ঠাট্টা করে বলে, 'আমাদের বাকি বকেয়া নেই মশাই!'
ওরা সহাস্যে সরে যায়। আবার দেখা যায় সেই সুসজ্জিত তোরণ।
লতা ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে পড়ে, 'বেলডাঙা শান্তি সম্মেলন।'